

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION**BENGALI****CODE:19****Unit- 9: ছন্দ ও অলঙ্কার****সূচীপত্র :****Sub Unit – 1:**

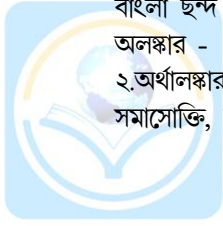
বাংলা ছন্দের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ।

Sub Unit – 2:

বাংলা ছন্দের রীতি ও রূপ ও বৈচিত্র্য।

Sub Unit – 3:

বাংলা ছন্দের পরিভাষা : পরিচয়, দল, কলা, মাত্রা, পর্ব, পর্বঙ্গ, অতিপর্ব, ছেদ, যতি, পংক্তি, স্তবক, লয়।

Sub Unit – 4:বাংলা ছন্দ চর্চার ইতিহাস (রবীন্দ্রনাথ), সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, প্রবোধচন্দ্র, অমূল্যধন ও তারাপদ ভট্টাচার্য
অলঙ্কার - ১. শব্দলঙ্কার :- অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি, পুনরুক্তিবদাভাস।২. অর্থালঙ্কার :- উপমা, রূপক, সন্দেহ, অপহুতি, নিশ্চয়, ভ্রান্তিমান, অতিশয়োক্তি, অপভ্রুত, প্রশংসা, ব্যতিরেক
সমাসোক্তি, উৎপ্রেক্ষা, বিরোধাভাস, বিষম, ব্যাজস্তুতি।

Text with Technology

Sub Unit - 1

ছন্দ

১। বাংলা ছন্দের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ :

বাংলা ভাষার যখন উদ্ভব হয় তার সীমানা আধুনিক বাংলা দেশের সীমানা ছেড়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভাষা বিবর্তনের ইতিহাসে বাংলা ভাষার আবির্ভাব সংস্কৃত - প্রাকৃত - অপভ্রংশ - অবহট্ট -এর পরবর্তী পর্যায়ে। যে ভাষা উন্নত কোন ভাষার রূপান্তর, সে ভাষাতে সাহিত্য সৃষ্টিতে কোন বাধা নেই। বাংলা সেইরকম একটি ভাষা।

চর্যাপদে - এ বাংলা সাহিত্যের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা ভাষা চর্যাপদ দিয়ে শুরু হয়েছে। ‘চর্যাপদ’ এই নামকরণের মধ্যে পদ বা গীতি সংকলনের ইঙ্গিত আছে। স্বভাবতই পদ বা গীতি ছন্দোবদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। ছন্দের আকারে যে পদগুলি আবদ্ধ হয় তার রূপ ও রীতি পৃথক হয়। ছন্দোবদ্ধ হল ছন্দের আকৃতি। আর ছন্দের রীতি হল ছন্দের প্রকৃতি। বাংলা ছন্দের রূপ ও রীতির ক্রমবিকাশের পাঠ নিম্নে দেওয়া হল।

বাংলা ছন্দের আদিরূপ ও প্রকৃতি মূলত চর্যাপদেই দেখা যায়। সংস্কৃত - প্রাকৃত - মৈথিল - ওড়িয়া - অপভ্রংশ - অবহট্ট প্রভৃতি ভাষার পথ অতিক্রম করেও তার উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে বাংলা ‘ছন্দোবদ্ধ’। বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতিতে যে সমস্ত ছন্দ প্রচলিত ছিল সেগুলি প্রধানত ‘বৃত্ত’ জাতীয়। চর্যাপদের ছন্দরূপ ও আকৃতিতেও সেই ধরনের ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে বাংলা ছন্দের যে মূল লক্ষণগুলি সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে তার প্রভেদ নির্দেশ করে সেগুলি হল:- সম মাত্রার দুই তিনটি পর্ব নিয়ে এক একটি চরন গঠন এবং পর্বাক্ষ সযোজনের আবশ্যিকতা অনুসারে দৈর্ঘ্য নির্ণয় - যা আমরা ‘বৌদ্ধগান ও দোহা’ র মধ্যে পাই। অন্য কোন প্রমান না থাকলেও বলা যায় যে - ‘চর্যাপদে’ আমরা প্রাকৃত প্রভৃতির যুগ অতিক্রম করেছি। নূতন ভাষার উদ্ভব হয়েছে। যেমন : পাদাকুলক - সংগঠন



কায় তরুণ/ পঞ্চ বি ডাল/ চঞ্চল চীএ / পই ঠো কাল (সংস্কৃত রীতি)।
ধামার্ধে চাটিল / সাক্ষু ম গঢ় ই / পার গামি লোঅ/ নিভরতরই (আধুনিকরীতি)।

বাংলার আদিমতম ও প্রধানতম দুটি ছন্দোবদ্ধ - যাদের পরে নাম হয়েছে পয়ার ও লাচাড়ি তাদের পরিচয়ও এখানে পাওয়া যায়। চর্যাপদের কোনো কোনো পদে চাতুর্মাত্রিক পর্বের (৪+৪+৪+৪) ছাঁচটিকে অক্ষত রেখেও কেবল ছত্রের দৈর্ঘ্যের হেরফেরের জন্য ছন্দের ধাঁচ ‘দোহা’, কিংবা ‘চউপাইয়া’ ছন্দের কাছাকাছি পৌছতে চেয়েছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে পাদাকুলক’ ই চর্যাপদ গীতিকার প্রধান ছন্দ।

“সংস্কৃত - প্রাকৃত দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ বাংলায় লুপ্ত হতে থাকায় চর্যাপদ গীতিকাতে মাঝে মাঝেই দীর্ঘস্বর যুক্ত দল গুরু দল হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি”।

(ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দরূপ :- ড: পবিত্র সরকার) তার ফলে দুমাত্রার বদলে এক মাত্রা মূল্য পেয়েছে।

টালত - মোর ঘর । নাহি পড় । বেষী হাড়িত । ভাত নাহি । নিতি আ ।

বেশী ভবনই । গহন গম- । ভীর বেগে । বাহী দুআন্তে । চিখিল । মাঝে ন । বাহী

শেষ দৃষ্টান্তে দেখা যাবে যে শুধুমাত্র দীর্ঘস্বরের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে তা নয়, কখনও বাংলা উচ্চারণ হোক, গানের তাল হোক - কোনো প্রভাবে হ্রস্বস্বরও দীর্ঘত্ব লাভ করেছে। ‘চিখিল’ তার একটি দৃষ্টান্ত এতে ‘চি’ কে দীর্ঘ দল না ধরলে ৪ মাত্রার পর্ব তৈরী হয় না।

পাদাকুলকের অনুসরণ করলেও চর্যাপদ গীতিকায় বাংলা উচ্চারণের স্বাধীনতা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত তাই কখনও দীর্ঘস্বরের দলকে লঘু দলের মূল্য দেয় গুরু দল হিসেবে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের দীর্ঘস্বর এখানে কখনও কখনও হ্রস্বস্বর হিসেবে গণ্য হয়েছে। আর হ্রস্বস্বর কখনও দীর্ঘস্বর হিসেবে গুরু দলের মূল্য পেয়েছে। পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এ এবং ব্রজবুলি আশ্রিত কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এই স্বাধীনতা প্রায়শই লক্ষণীয়।

মধ্যযুগের মাত্রাবৃত্ত (কলাবৃত্ত ছন্দ)

মধ্যযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণব পদাবলীতে যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অনুসরণ ঘটেছে তার উৎস প্রাকৃত - অপভ্রংশ কবিতা নয়, প্রথমে জয়দেবের গীতগোবিন্দ, পরে বিদ্যাপতির মৈথিল কবিতা। “কলাবৃত্তের উত্তর লৌকিক বাংলা স্বাভাবিক উচ্চারণ প্রভাবের অনিবার্য পরিণাম এই নবছন্দ, যার আধুনিকতম নাম মিশ্রকলাবৃত্ত বা অর্ধকলাবৃত্ত। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, লৌকিক প্রভাবে প্রত্নকলাবৃত্তের বিবর্তিত রূপ হল মিশ্রকলাবৃত্ত রীতি।” (আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ পৃ: ৩৮ - রামবহাল তেওয়ারীর)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাব্য দেহে মিশ্রকলাবৃত্ত সুপ্রদর্শিত হয়নি। তবু যে পরিবর্তনগুলি সাধিত হয়েছে -

১. গুরু ও দীর্ঘস্বরের দ্বিমাত্রিকতা বর্জন হয়েছে।
 ২. প্রথম ও নবম মাত্রায় শ্বাসাঘাতের প্রবর্তন।
 ৩. মিশ্র কলা বৃত্তের চতুর্দশ মাত্রা যুক্ত পয়ারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা চলছে।
- সভে দেবে মেলি সভা। পাতিল আকাশে (৮ + ৬)
কথসের কারণে হত্র। সৃষ্টির বিনাশে (৮ + ৬)

U1-3

এখানে ১ কং এ শে ভা ইত্যাদি গুরুদল হওয়া সত্ত্বেও ১ মাত্রা হিসেবে গণ্য হয়েছে। পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি বহু প্রচলিত বাংলার বিশিষ্ট ছন্দোবন্ধের আদিম বা অপরিণত রূপের পরিচয় মেলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে। এ প্রসঙ্গে তারাপদ ভট্টাচার্য বলেছেন-

১. “সেখানে (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে) অপরিণত পয়ার, অপরিণত ত্রিপদী বা লাচাড়ি সবই আদিম অবস্থায় আছে। এমন কী পরবর্তীকালে ‘লঘু ত্রিপদী’ ‘দিগম্বর’ ‘একাবলী’ প্রভৃতি যে সমস্ত বাংলা ছন্দ দেখা যায়, সেগুলি অপরিণত আকারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রয়েছে।”

২. “শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সমস্ত ছন্দই আসলে ধামালী ছন্দ।”

ক) “ধামালী ছন্দের নাম নয়, রচনার বিষয়গত নাম। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ লৌকিক ছন্দ দ্বারা প্রভাবিত।”

(প্রবোধচন্দ্র সেন)

সুতরাং, বিভিন্ন নানাবিধ অভিমত থেকে সুস্পষ্ট শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের উৎস তথা অনুসৃতি ও প্রকৃতিতে মিশ্র রূপ বর্তমান। প্রাকৃতচৈতন্যযুগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সমকালে বা কিছু পরে রচনা মালাধর বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ কাব্যে খাঁটি বাংলা তদ্বৎ ছন্দ সুগঠিত আকারে আত্মপ্রকাশ করে। ‘পয়ার’ শব্দের প্রথম প্রয়োগ পাওয়া যায় ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ কাব্যে। মালাধর বসু লিখেছেন - “ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বাক্সিয়া লোক নিস্তারিতে গাই পাঁচালী রচিয়া।” ‘পয়ার’ শব্দটির উৎস ও প্রয়োগ নিয়ে নানা অভিমত আছে। সেগুলি হল:

১) রামগতি ন্যায় রত্ন : পায় (৮)পয়ার - অর্থপাদ চরণ বিশিষ্ট। সুকুমার সেন : পজঝটিকা - পাদাকুলক(৮)পদকার(৮)পয়ার। ‘পয়ার’ নামটি মধ্যযুগে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হত। ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ ছাড়াও মঙ্গল কাব্য চরিত কাব্য, অনুবাদ কাব্য সর্বত্রই বাংলা ভাষার নিজস্ব তদ্বৎ ছন্দ ‘পয়ার’ নামে, এ পরিচিত।

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বলেন, - “বাংলা কাব্যে যেটি সনাতন ও সর্বাপেক্ষা বেশি প্রচলিত রীতি, তাহার নাম দিতেছি পয়ারের রীতি।” কিন্তু প্রবোধচন্দ্র সেন মনে করেন পয়ার একটি নির্দিষ্ট আকারের ছন্দোবন্ধের নাম। কোন ছন্দোবন্ধের নাম নয়। তা হল -

(১) প্রতি চরণে চৌদ্দ অক্ষর বা চৌদ্দ মাত্রা। আট অক্ষর বা মাত্রার পর অর্ধযতি এবং পরবর্তী ছয় অক্ষর বা মাত্রার পর পূর্ণযতি। অর্থাৎ পয়ারের চরণ - ৮ + ৬ = ১৪ মাত্রা

এই বিশিষ্ট রূপ কলাই পয়ার নামে অভিহিত। চরণের আকার বা মাত্রা সংখ্যার পরিবর্তন ঘটলে পয়ারের নামেরও পরিবর্তন ঘটতো। যেমন:

ক) দিগদরা - দশ অক্ষর বা দশমাত্রার চরণ

খ) লঘু ত্রিপদী - ৬+৬+৮ অক্ষরে চরণে।

গ) দীর্ঘ ত্রিপদী - ৮+৮+১০ অক্ষরে চরণ

ঘ) পয়ার - ৮+৬ অক্ষরে চরণ

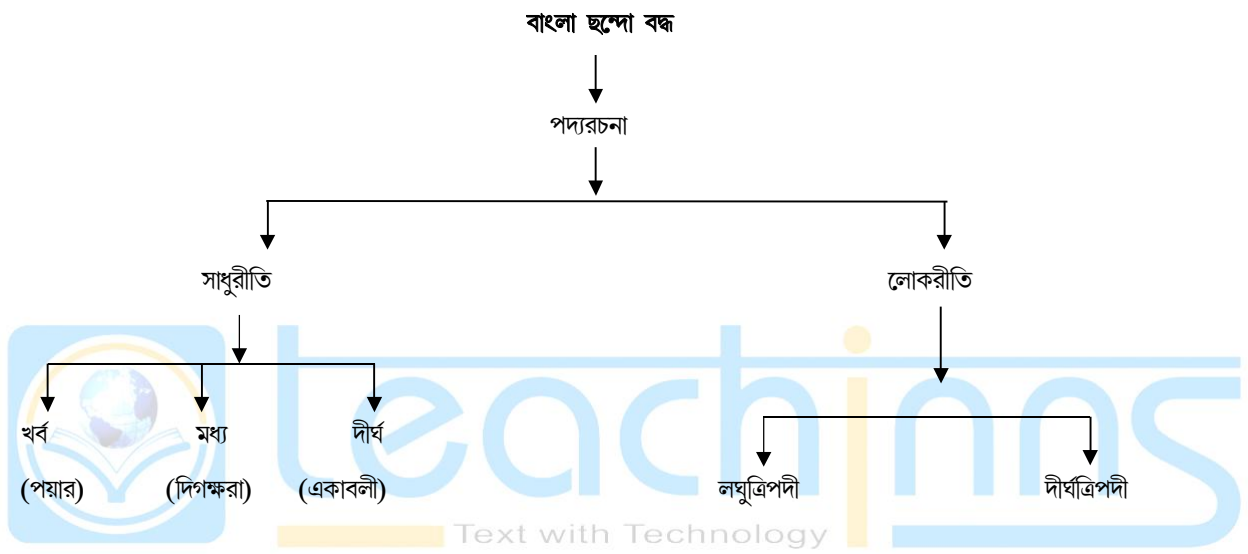
ঙ) মহাপয়ার - ১০+৮ অক্ষরে চরণ ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন প্রাচীন বাংলায় সাধুরীতির ছন্দকেই পয়ার বলা হত। তারপর ত্রিপদী নামে পরিচিত হতে থাকে। সমগ্র মধ্যযুগ ধরে দুটি ছন্দোবদ্ধ রূপ প্রচলিত ছিল- ১) ‘পয়ার’ ২) ‘ত্রিপদী’।

প্রাক চৈতন্যযুগে বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণ দেব দুজনেই পয়ারের দোসর হিসেবে লাচাড়ির কথা বলেছেন। অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বলেছেন - “লাচাড়ি - যাহার নাম পরে হয়েছিল ত্রিপদী”।

তারাপদ ভট্টাচার্যও সহমত পোষন করেছেন - “লাচাড়ির অন্য নাম দীর্ঘ ত্রিপদী। সেকালে বলা হত লাচাড়ি। নৃত্যবৃত্ত থেকে সম্ভবত লাচাড়ি শব্দ উৎপন্ন”। তাই লাচাড়ি ও ত্রিপদীকে একই ছন্দোবন্ধের নামান্তর হিসেবে গ্রহন করেছেন।

পয়ার ও ত্রিপদীকে অনেকে ভিন্নরূপে দেখেছেন। যেমন প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর “নতুন ছন্দ” পরিক্রমা গ্রন্থে বলেছেন - “প্রাচীনকালে সাধুরীতির ছন্দের নাম ছিল পয়ার এবং লৌকিক ছন্দের (দেশি ছন্দের) নাম ছিল লাচাড়ি”।

একই অভিমতের সমর্থক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায়। ঐদের মতে লাচাড়ি কোন ছন্দোবন্ধ নয়। এটি একটি ছন্দরীতি। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন - “নৃত্য নিরপেক্ষ ত্রিপদী বন্ধেরই পূর্বতন নাম লাচাড়ি” এ মন্তব্য সর্বজন মান্য বলে বিবেচিত হয়েছে।



প্রশ্নমাত্রাবৃত্ত মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে তথা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ও বৈষ্ণব পদাবলীতে যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অনুসরণ ঘটেছে তা প্রাকৃত - অপভ্রংশ অবহট্টের মধ্য দিয়ে ছন্দ বিবর্তনের ফলে জাত নয়। লোকরীতি থেকে আগত নয়। গৃহীত কলাবৃত্ত ছন্দের বিবর্তিত রূপ। বাংলা সাহিত্যের দুজন কবি জয়দেব ও বিদ্যাপতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এই ধারায়। দুজনে - কেউই বাংলা ভাষায় পদ রচনা করেননি। জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় ‘শ্রীগীতগোবিন্দম’ রচনা করেন আর বিদ্যাপতি মৈথিল ভাষায় বৈষ্ণবপদাবলী রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যে জয়দেব ও বিদ্যাপতির প্রভাব সুদূরপ্রসারী। বিদ্যাপতির পদাবলীর অনুসৃতি ‘ব্রজবুলি’ নামে একটি সাহিত্যিক ভাষার জন্ম হয়। এই ব্রজবুলি আসলে মৈথিলি এবং প্রাদেশিক বাংলা বা হিন্দী বা ওড়িয়া কিংবা অসমিয়া ভাষার বিমিশ্রণে গড়ে ওঠা কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির দ্বারা এতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন যে বাংলা সাহিত্যে তাঁকে ‘দ্বিতীয় বিদ্যাপতি’র অভিধা দেওয়া হয়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ও চতুর্মাত্রিক পর্ব গঠনের দৃষ্টান্ত মেলে জয়দেবের পদে।

যেমন :-

শ্রু সি ত পা ব ন মনু । পম পরি । না হম্ ৪+৪+৪+৩

ম দ ন দ । হন মিব /ব হ তি য । দা হম্ ৪+৪+৪+৩

কবি বিদ্যাপতির বৈষ্ণবপদাবলীতে মাত্রাবৃত্ত রীতির প্রয়োগ আছে। যেমন :-

কি কহ । ব রে সখি । আনন্দ । ওর ৪+৪+৪+২

চির দিন । মা ধ ব । মন্দিরে । মোর ৪+৪+৪+২

বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের যে মূলনীতি মুক্তদল ‘১’ মাত্রা এবং রুদ্ধদল ‘২’ মাত্রা তা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সর্বত্র প্রযোজ্য হয়নি। প্রাচীন মাত্রাবৃত্তে রুদ্ধদল ও দীর্ঘস্বরযুক্ত মুক্তদলের গুরুদল হিসাবে মর্যাদা মাঝে মাঝে শিথিল হয়ে পড়েছে। কিন্তু আধুনিক মাত্রাবৃত্তে কেবল রুদ্ধ দলই গুরুদল হিসেবে গন্য। এর যথাযথ প্রয়োগ মধ্যযুগীয় সাহিত্যে সম্ভব হয়নি।

প্রাগাধুনিক দলবৃত্ত:

ধূনির ঐক্যের সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্র্যের সমাবেশেই ছন্দ। ঐক্য তাকে দেয় প্রাণ, বৈচিত্র্য তাকে দেয় রূপ, ছন্দের যে বিচিত্র ব্যঞ্জনশক্তি, প্রানের রসকে রূপায়িত করার যে ক্ষমতা, কাব্যের বাণীকে কানের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করানোর যে শক্তি আছে- তা নির্ভর করে, বৈচিত্র্যের উপযুক্ত সমাবেশের উপর। আধুনিক বাংলা ছন্দের একটা স্পষ্ট রীতি গড়ে ওঠবার আগের সূত্রটা ভাল নির্দিষ্ট ছিল না। যখন তথাকথিত বর্ন মাত্রিক বা হরফ গোনা ছন্দোবন্ধের রীতিটা স্পষ্ট হল, তখন একটা নির্ভরযোগ্য ঐক্যসূত্র খুঁজে পেয়ে বাংলা কবিতাও একটা সুনির্দিষ্ট পথে চলতে শুরু করল। বাংলা ছন্দ কয়েক শতাব্দী ধরে যে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল তার সেই প্রয়াসের চরম পরিণতি ও সার্থকতা দেখা গেল ভারতচন্দ্রের কাব্যে, ভারতচন্দ্র একটা নতুন চণ্ডের ছন্দ বাংলা সাহিত্যে প্রচলন করলেন - বাংলা গ্রাম্যছড়ার ছন্দ। যা লোক উৎসে জাত। বাংলার লোক সমাজে প্রচলিত ছড়া, গান, বাজনা, খেলা ইত্যাদির নিজস্ব ছন্দ হল দলবৃত্ত। এই ছন্দের বিশেষত্ব এই যে, এতে প্রবল শ্বাসঘাত থাকে। তার জন্য একটা বিশেষ দোলা ও আনন্দ অনুভব করা যায়। প্রতি পর্ব চারমাত্রা, ও দুটি পর্বান্ত। সাহিত্যিক ঐতিহ্য-না থাকায় এই ছন্দ অকুলীন বলে পরিচিত হলেও দলবৃত্ত ছন্দটিই বাংলা ভাষার নিজস্ব ছন্দ।

দলবৃত্ত ছন্দ মধ্যযুগীয় সাহিত্যে কৌলিন্য অর্জন না করলেও ব্রাত্য হয়ে থাকেনি।

যেমন:- ছড়া- ১

বৃষ্টি পড়ে / টাপুর টুপুর / নদেয় এল / বান ৪+৪+৪+২

শিব ঠাকুরের / বিয়ে হবে / তিন কন্যে / দান ৪+৪+৪(৩)+২

দলবৃত্ত ছন্দ চারমাত্রার গর্ব গঠন করে। রুদ্ধদল ও মুক্তদল সবই একমাত্রা বলে গন্য হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তির তিন কন্যে পর্বটি তিন মাত্রার হয়ে পড়ে। কিন্তু পর্ব সমতা বিধানের জন্য রুদ্ধদলে বিশিষ্ট উচ্চারণে মাত্রা সম্প্রসারণ ঘটিয়ে চারমাত্রা করে নিতে হবে।

২/ এপারেতে / লক্ষা গাছটি / রাঙা টুক টুক /করে ৪+৪+৪+২

গুণ বতী / ভাই আমার / মন কেমন /করে / ৪+৪+৪+২

শ্বাসঘাত প্রধান- মা । নিম খাওয়ালে / চিনি, বলে কথায় করে ছলো।

ওমা । মিঠার লোভে / তিতো মুখে / সারা দিনটা / গেলো।।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষা দীক্ষার প্রবল প্রভাবে বাংলা ছন্দেও একটা বিপ্লবের সূচনা হল। ঈশ্বরগুপ্ত ভারতচন্দ্রের পাদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, তবুও তিনি ছড়ার ছন্দকে সাহিত্যে কতটা জাতে তুলবার কাজ করেছেন। তারপর এল বৈচিত্র্য সন্ধানের যুগ। নতুন নতুন সংকেতে চরন গঠন করার প্রয়াস এবং নানা বিচিত্র নক্সায় স্তবক গড়ে তোলার প্রয়াস চলল। সে চেষ্টার বোধহয় চরম পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। চরণ ও স্তবকের গঠন বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়া আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের অনুভূতির ব্যঞ্জনা হয়েছে। মধুসূদনের ‘বজ্রাঙ্গনার’র বেদনা, ‘আত্মবিলাপের’ বিষাদ রবীন্দ্রনাথের ‘পূর্ববীর আত্মানু’ পর্যন্ত এই বৈচিত্র্য ধূনিত হয়েছে।

আধুনিক ছন্দে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে আরও দুই এক দিক থেকে। হলন্ত অক্ষর বাংলায় দীর্ঘ হতে পারে, রবীন্দ্রনাথই সবসময় হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ বলে একটা প্রথা চালিয়েছেন। তার ফলে আধুনিক বাংলায় একটা বিশিষ্ট মাত্রাছন্দ চালু হয়েছে। তারপর বড় যুগান্তর এল মধুসূদনের ‘অমিত্রাক্ষর’ ছন্দ সৃষ্টিতে। তিনি দেখালেন বাংলায় ছন্দ যতির অনুগামী হওয়ার কোন আবশ্যিকতা নেই। এইখানে বাংলা ছন্দ প্রথম পেল স্বেচ্ছাবিহার ও মুক্তির স্বাদ। রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা ছন্দ একটা অনন্য মাত্রা পেয়েছে।

Sub Unit - 2

বাংলা ছন্দের রীতি ও রূপবৈচিত্র্য

ছন্দের রীতি ও রূপ বৈচিত্র্য পাঠে অবগত হওয়া গেছে যে মাত্রাবিন্যাস রীতির উপর ছন্দের ধ্বনিপ্রকৃতি তথা শ্রুতিরূপ নির্ভর করে। বাংলা ছন্দে মাত্রা বিন্যাস হয় তিনটি স্বতন্ত্র রীতিতে। আমরা প্রবোধচন্দ্র সেনের দেওয়া নতুন নামগুলিকে ভিত্তি করে অন্যদের দেওয়া নামের একটি তালিকা এভাবে সাজাতে পারি। প্রবোধচন্দ্র সেনের দেওয়া তিন ধরনের বাংলা ছন্দের শেষতম নামকরণ -

- ১) দলমাত্রক বা দলবৃত্ত রীতি (ছড়ার ছন্দ বা স্বরবৃত্ত)
 - ২) কলামাত্রক বা কলাবৃত্ত (মাত্রাবৃত্ত)
 - ৩) 'মিশ্রকলাবৃত্ত' বা মিশ্রকলা মাত্রক মিশ্রবৃত্ত (তথাকথিত অক্ষরবৃত্ত)
- অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ১. তানপ্রধান ২. ধ্বনিপ্রধান ৩. শ্বাসাঘাতপ্রধান
দিলীপকুমার রায় - ১. স্বরবৃত্ত ২. মাত্রাবৃত্ত ৩. অক্ষরবৃত্ত

১) স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্ত শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ :

এক শ্রেণীর ছন্দে পর্বে গঠিত হয় দলমাত্রার যোগে অর্থাৎ এই শ্রেণীর ছন্দ পর্বগঠনের কাজে প্রত্যেক দলকে এক মাত্রা বলে স্বীকার করে নেওয়াই প্রচলিত রীতি। মাত্রা বিন্যাসের এই রীতিকে বলা হয় দলমাত্রক বা দলবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত রীতি। এই জাতীয় ছন্দের লয় দুত। প্রায় প্রত্যেক পর্বেই একটি প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে। তাই একে শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ বলে।

২) কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত রীতি :

যে রীতিতে ছন্দপর্ব গঠিত হয় কলামাত্রা নিয়ে তাকে বলা যায় কলামাত্রক বা কলাবৃত্ত রীতি। এখানে সব রুদ্ধ দল দুই কলামাত্রা এবং মুক্তদল এক কলামাত্রা গণনা করা হয়।

৩) মিশ্রকলাবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত রীতি :

যে রীতিতে কলামাত্রা নিয়ে ছন্দ পর্ব গঠিত হয়, যেখানে প্রত্যেক মুক্তদল (স্বরান্ত অক্ষরকে) একমাত্রা ধরা হয়, রুদ্ধদল (হলন্ত অক্ষরকে) শব্দের শেষে থাকলে কিংবা স্থান বিশেষে দুই মাত্রার ধরা হয় তাকে মিশ্রকলাবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত রীতি বলা হয়। মূলত পর্বের মাত্রাগুলির রূপ ও উচ্চারণের পার্থক্যের জন্য তিন রীতির ছন্দের পার্থক্য বোঝানোর প্রচেষ্টা করা গেল দলবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দরীতি -

ঠাকুরদাদার । মতো বনে । আছেন ঋষি । মুনি।
তাদের পায়ে । প্রণাম করে । গল্প অনেক । শুনি।

ক) স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্ত রীতিতে প্রতি পূর্ণ পর্বে আছে চারটি করে। আর অপূর্ণ পর্বে দুটি করে। রুদ্ধদল গুলি সংকুচিত হয়ে মুক্ত দলের সমান হয়ে যায়। অর্থাৎ মুক্ত ও রুদ্ধ নির্বিশেষে সবদলই হয় সমান মানের।

খ) কিন্তু একটি মাত্রা রুদ্ধদল পংক্তির অন্ত্যে থাকলে উচ্চারণে সেটি প্রলম্বিত হয়ে দুই দলের আসন অধিকার করে।

২. কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত রীতি :

ক - ললোলে । কোলা হলে । জাগে এ-ক । ধ্বনি,
অ - নধে - র । ক-নঠে -র । গা - ন আগ । মনী ।

১. এই ছন্দে রুদ্ধদলগুলি প্রসারিত হয়ে মুক্তদলের দ্বিগুণ হয়ে যায়, অর্থাৎ দুটি মুক্তদলের সমান হয়। প্রতি পর্বে পাওয়া যাবে চারকলা, অপূর্ণ পর্বে দুইকলা। [(একটি অনায়ত মুক্তদলের সমপরিমাণ ধ্বনির পারিভাষিক নামকলা)]। কলাসংখ্যার এই সমতার উপরেই এই রীতি প্রতিষ্ঠিত।

২. কলাবৃত্ত রীতিতে অনেক সময় রুদ্ধদল প্রসারিত না হয়ে সংকুচিত হয়ে এক কলামাত্রায় পরিণত হয়।

৩. অনেক সময় কলাবৃত্ত রীতিতে রুদ্ধদল প্রসারিত হয়ে তিনমাত্রায় পরিণত করার দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে।

মিশ্রবৃত্ত রীতি বা অক্ষরবৃত্ত :

যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়, সকলই দুর্লভ বলে অজি মনে হয়।

যা - হা কি - ছু হে - রি চো- খে । কি -ছু তুচ - ছো নয় = ৮/৬

স -কো - লি - দুর - লভ্ বো -লে /আ - জি মো - নে হয় = ৮/৬

ক) এখানে মুক্তদল একমাত্রা, রুদ্ধদল শব্দ শেষে বা একক শব্দে দু মাত্রা, অন্যত্র একমাত্রা।

খ) প্রতিছত্রে পূর্ণপর্ব ৮ মাত্রার। অপূর্ণ পর্ব ৬ মাত্রার। উপরের দৃষ্টান্ত ‘নয়’ লভ্ ও হয় তিনটি পদান্তস্থিত -

রুদ্ধদল। কিন্তু পদের শেষে নয়, রুদ্ধদল ‘তুচ’ ‘দুর’ - একমাত্রার।

গ) তৎসম শব্দের অপ্রান্ত রুদ্ধদল সাধারণত: সংকুচিত ও একমাত্রক হয়। অ-তৎসম শব্দের আদি ও মধ্যস্থিত রুদ্ধদলও যুক্তক্ষেপে প্রকাশিত হলে একমাত্রক বলে গণ্য হয়।

ছন্দের নাম বৈচিত্র্য :

কবিকৃত ছদ্মনাম	দলবৃত্ত	কলাবৃত্ত	মিশ্রবৃত্ত
১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বাংলা	সাধু	সাধু, পুরাতন
২. দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়	প্রাকৃত	নূতন মিত্রাক্ষর	মিত্রাক্ষর,
৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	মাত্রিক চিত্র্য	হাদ্যা	পুরাতন আদ্যা
৪. মোহিতলাল মজুমদার	পর্বভূমক অক্ষরবৃত্ত	পর্বভূমক মাত্রাবৃত্ত	পদভূমক
৫. কালিদাস রায়	দলমাত্রিক বা পাদক	স্বরমাত্রিক মাত্রিক	বর্ণবৃত্ত
৬. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	মাত্রিক স্বরান্তিক স্বরবৃত্ত	মাত্রাবৃত্ত	অক্ষর মাত্রিক
৭. দিলীপকুমার রায়			আক্ষরিক অক্ষরবৃত্ত

ছন্দসিক - কৃতছদ্মনাম	দলবৃত্ত	কলাবৃত্ত	মিশ্রবৃত্ত
১. প্রবোধচন্দ্র সেন (১৯২২-১৯৮৯)	স্বরবৃত্ত দলবৃত্ত	মাত্রাবৃত্ত সরল কলাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত ধ্বনিপ্রধান মাত্রাবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত শুদ্ধ	অক্ষরবৃত্ত মিশ্রকলাবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্ত তানপ্রধান
২. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়	শ্বাসাতপ্রধান	প্রাকৃত মাত্রাবৃত্ত	অক্ষরমাত্রিক
৩. রাখালরাজ রায়	স্বরমাত্রিক দলবৃত্ত	কলাবৃত্ত	অক্ষরবৃত্ত
৪. তারাপদ ভট্টাচার্য	দেশজ স্বরবৃত্ত		ভঙ্গপ্রাকৃত
৫. সুধীভূষণ ভট্টাচার্য	নীলরতন সেন		অক্ষরবৃত্ত
৬. আবদুল কাদির			মিশ্রবৃত্ত
৭. নীলরতন সেন			

Sub Unit – 3

বাংলা ছন্দের পরিভাষা পরিচয়

(দল, কলা, মাত্রা, পর্ব, অতিপর্ব, ছেদ, যতি, পংক্তি, স্তবক, মিল, লয়)

বাংলা ছন্দ কারেরা ছন্দের বিশ্লেষণে নিজস্ব মতামত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বিভিন্ন পরিভাষা নির্মাণ করেছেন। ফলে অনেক ধরনের মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। ছান্দসিকদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে পরিভাষা বিতর্ক এড়িয়ে সর্বজনস্বীকৃত ও সুনির্দিষ্ট প্রণালীর উপর বাংলা ছন্দশাস্ত্রকে এখনও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি।

দল :- স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনিকে দল (syllable) বলে। ইংরেজি ‘সিলেবল’ এর বাংলা পরিভাষা ‘দল’ শব্দটিকে মান্যতা দিয়েছেন প্রবোধচন্দ্র সেন। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় সিলেবল অর্থে ‘অক্ষর’ শব্দটিকে প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু অক্ষর বলতে বর্ণকেও বোঝায়, তাই তা দু ধরনের অর্থকে বোঝায়। পারিভাষিক গরিমা থাকে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রলাল সিলেবল অর্থে ‘মাত্রা’ শব্দটিকে প্রয়োগ করেছেন। বাংলা ছন্দশাস্ত্রে ‘মাত্রা’ শব্দের ভিন্ন অর্থ আছে। সুতরাং ছন্দ আলোচনায় মাত্রা শব্দটিকে দ্বিতীয় অর্থে প্রয়োগ করলে পারিভাষিক উদ্দেশ্য নষ্ট হয় এবং বোঝার ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটে। দলটির চরিত্র বলতে আমরা বুঝব সেটি ‘রুদ্ধ’(Closed) ‘মুক্ত’ (Open)। মুক্তদল হল স্বরান্ত। রুদ্ধদল হল অর্ধস্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত। উচ্চারণ ভেদে দলের দুইরূপ হ্রস্বদল (Short syllable) এবং দীর্ঘদল (long syllable)। মুক্তদল হল সেই সিলেবল যার উচ্চারণ ধ্বনিতে শেষ হয়। যেমন যা,খা,দে ইত্যাদি। আর রুদ্ধদল শেষ হয় ব্যঞ্জনে বা অর্ধস্বরে যেমন - আম, ভাই শেষ,বই।

কলা :- একটি হ্রস্বস্বর বা হ্রস্বস্বরান্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সমপরিমাণ ধ্বনিকে ছন্দপরিভাষায় কলা (লক্ষ্মণ) বলে। অর্থাৎ কলা হল হ্রস্বরূপে উচ্চারিত অপসারিত মুক্ত বা রুদ্ধদলের সমপরিমাণ ধ্বনির পারিভাষিক নাম। মুক্ত বা রুদ্ধ হ্রস্ব দল এককলা হিসেবে গণ্য। আবার মুক্ত বা রুদ্ধ দল দীর্ঘ হলে তা দুইকলা হিসাবে গণ্য।

মাত্রা :- যার সাহায্যে কোন কিছুই আয়তন মাপা যায় সেই পরিমাপক উপকরণের পারিভাষিক নাম মাত্রা (যশভট্ট যপ লনতড়য়ক্ষণ)। বাংলায় ছন্দপর্ব পরিমিত হয় দুইরকম মাত্রার সাহায্যে।

১) এক শ্রেণীর ছন্দে প্রত্যেকটি দলই (মুক্ত বা রুদ্ধ) এক মাত্রা বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে। এ রকম মাত্রাকে বলা হয় দলমাত্রা।

২) আর এক শ্রেণীর ছন্দে প্রসারিত দল অপসারিত দলের দ্বিগুন বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে। সুতরাং অপসারিত দলকে এক কলা এবং প্রসারিত দলকে দুইকলা বলে গণনা করলে এই শ্রেণীর ছন্দপর্বের ধ্বনি পরিমাণ নির্ণীত হয়। অর্থাৎ এই শ্রেণীর ছন্দে এক কলাই এক মাত্রা।

প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন - “তাই এ -রকম মাত্রাকে বলতে পারি কলামাত্রা”।

পর্ব-হ্রস্ব- যতিরদ্বারা নির্দিষ্ট খন্ডিত ধ্বনিপ্রবাহকে পর্ব বলে। পর্ব তিন প্রকার - ১. পূর্ণপর্ব, ২. অপূর্ণপর্ব ৩. অতিপর্ব।

১. পূর্ণপর্ব :- দুই বা ততোধিক পর্বক্ষেপে গঠিত চরনের আদি থেকে প্রথম হ্রস্বযতি পর্যন্ত খন্ডিত ধ্বনিপ্রবাহ যা বারং বার পুনরাবৃত্ত হয় তাকে পূর্ণপর্ব বলে।

২. অপূর্ণপর্ব :- অপূর্ণপর্ব থাকে পদ্যের প্রতিটি সারির শেষে। অর্থাৎ লপদ্যছত্রের শেষের খন্ডপর্বই হল অপূর্ণপর্ব।

দৃষ্টান্ত :-

খোদার ঘরে কে/কপাট লাগায়/ কে দেয় সেখানে/তাল সব দ্বার এর/খোলা রবে চলো/ হাতুড়ি শাবল /চালা

[নজরুল]

অপূর্ণ পর্বমূল পর্বের চেয়ে ছোটো হবে। এটাই শর্ত।

৩. অতিপর্ব :- অনেক সময় কবিতার মূল যে ছত্র, তার শুরুতে একটি খন্ডিত পর্ব বসানো হয়। তাই বলা যেতে পারে “ছন্দের দিক থেকে অতিরিক্ত, ছত্রপাটে আলংকারিক ধ্বন্যভিষ্যাত সৃষ্টির জন্য ছত্রের প্রারম্ভে স্থাপিত যে খন্ডপর্ব,” তাই অতিপর্ব।

দৃষ্টান্ত :-

ওরে তোরা কি জানিস / কেউ,
জলে কেন ওঠে এত / ঢেউ ওরা দিবস রজনী / নাচে - তাহা শিখেছে কাহার / কাছে
[রবীন্দ্রনাথ]

পর্বের বৈশিষ্ট্য -

- ১) পর্বমাত্রই কয়েকটি শব্দের সমষ্টি।
- ২) প্রত্যেকটি পর্ব দুইটি বা তিনটি পর্বঙ্গের সমষ্টি।
- ৩) ছন্দের মূল ভিত্তি একটা ঐক্য। সেই ঐক্যের পরিচয় আমরা পাই পর্বের ব্যবহারে।

পর্বঙ্গ :- পর্বের এক একটি সংগঠন পরীক্ষা করলে দেখা যায় -এর মধ্যে ক্ষুদ্রতম কয়েকটি অঙ্গ উপাদান রূপে বর্তমান।
এই গুলিকে বলা হয় পর্বঙ্গ।

যেমন - শুধু : বিধে : দুই/ ছিল : মোর : ভুই/ আর : সবি : গেছে / ঝনে।

পংক্তিটি তিনটি পূর্ণপর্ব এবং একটি অপূর্ণপর্ব। ‘:’ চিহ্ন দ্বারা পর্বঙ্গ বা উপপর্ব চিহ্নিত করা হয়। প্রতিটি পূর্ণপর্ব তিনটি উপপর্ব বা পর্বঙ্গে বিভক্ত। পর্বঙ্গের বৈশিষ্ট্য:-

- ১) প্রত্যেক পর্বে, হয় দুটি না হয় তিনটি করে পর্বঙ্গ থাকবে। না হলে পর্বের কোন ছন্দ লক্ষণ থাকে না। মাত্র একটি পর্বঙ্গ দিয়ে কোন পূর্ণ অবয়ব পর্ব রচনা করা যায় না।
- ২) পর্বঙ্গ সাধারণত : এক একটা ছোট গোট মূলশব্দ। পর্বঙ্গের মাত্রাসংখ্যা হয় ২, ৩, বা ৪ কখনও ১
- ৩) পর্বঙ্গ কিন্তু ছন্দের হিসাবে একেবারে পরমাণুর মত, তার নিজের কোন তরঙ্গ বা গতি নেই, কিন্তু তাকে অপর পর্বঙ্গের পাশে বসালে ছন্দের তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। পর্বঙ্গের বিভাগ দেখাবার জন্য [:] চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

ছেদ ও যতি :- গদ্যের অনিয়মিত বিরাম, যা বাক্যে পদ বা পদগুচ্ছের অন্তর্গত (Syntactic) ভূমিকার উপর নির্ভর করে তাকে বলে ছেদ। কবিতার ছন্দশাসিত যে যান্ত্রিক বিরাম, যা সাধারণভাবে কবিতার ছত্রকে সমান সমান খণ্ডে বিভক্ত করে তার নাম যতি। ছেদ ও যতির পার্থক্য :-

১. ছেদ অব্যয় ও অর্থ নির্ভর, যতি বেশিরভাগ ছন্দ ছন্দ নিয়ন্ত্রিত, এবং শব্দ ও শব্দগুচ্ছ নির্ভর।
২. ছেদ সাধারণত বিষয় - পরস্পর অর্থাৎ গদ্যে বা গদ্যখণ্ডে দুয়ের বেশি ছেদ থাকলে তাদের দূরত্ব সমান না হওয়া সম্ভব। পদ্যের যতিগুলি সাধারণভাবে সমপরস্পর অর্থাৎ একে অন্যের থেকে সমান সমান দূরত্বে অবস্থিত থাকে।
৩. ছেদ অর্থ বা ভাবশাসিত, যতি যান্ত্রিক। এই জন্য ছেদ বাক্যগঠন নির্ভর, কিন্তু যতি কথার ব্যাকরণের সঙ্গে সম্পর্কহীন। কেবল ছন্দ - ধ্বনির ব্যাকরণের সঙ্গে তা যুক্ত।

যতির প্রকারভেদ - ধ্বনিপ্রবাহের উত্থান - পতনের উপর ভিত্তি করে চরণকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। পদ, পর্ব, পর্বঙ্গ ও দল। ছন্দবিভাগের নাম অনুসারে এগুলি যথাক্রমে পদযতি = অর্ধযতি (II) পর্বযতি = লঘুযতি (I) পর্বঙ্গযতি = উপযতি (:) ও দলযতি = অনুযতি (,) দ্বারা নির্দেশিত হয়। আর চরণকে চরণযতি = পূর্ণযতি (ঐ) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

পংক্তি ও চরণ :- এক একাধিক পদের সমন্বয়ে পংক্তি বা ছত্র গড়ে ওঠে। পংক্তি বা ছত্র হল চরণকে লিখে সাজানোর কৌশল। পদের আরম্ভ বা পূর্ণযতির পর থেকে পরবর্তী পূর্ণযতি পর্যন্ত পদ্যাংশকে চরণ বলে। পদের সংখ্যা অনুযায়ী চরণকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী।

ক) একপদী - পংক্তিতে একটি মাত্র পদ থাকলে তাকে একপদী বলে। এক্ষেত্রে এ পংক্তিতে পদবিভাজক কোনো অর্থ যতি থাকবে না। যেমন : - ১ গঙ্গারামকে। পাত্র পেলে। জানতে চাও সে। কেমন ছেলে।

খ) দ্বিপদী - পংক্তিতে পদের সংখ্যা দুটি হলে হবে দ্বিপদী। এখানে একটি অর্ধযতি এ দুটি পদকে পৃথক করবে। আমাদের ছোটো নদী।। চলে আঁকেবাকি/ বৈশাখ মাসে তার// হাঁটুজল / থাকে/

পংক্তি পদের সংখ্যা তিনটি হলে যে ছন্দ - বন্ধ ত্রিপদী। দুটি অর্ধযতি তিনটি পদকে পৃথক করবে।

যেমন - তাকিয়ে থাক পৃথিবীটা।। তোমার কাছে। হার মেনে সে // বাঁচবে কেমন। করে।
যেখানে যাও। অতৃপ্তি আর।। তৃপ্তি দুটো। জোড়ায় জোড়ায়।। সদরে অনঃ দরে।

গ) চৌপদী - পঙক্তিতে পদের সংখ্যা চারটি হলে তা চৌপদী। এক্ষেত্রে তিনটি অর্ধযতি প্রত্যাশিত।

যেমন - রক্ত আলোর । মদে মাতাল । ভোরে (।।)
আজকে যে যা । বলে বলুক । তোরে, (।।)
সকল তর্ক । হেলায় তুচ্ছ । করে (।।)
পুচ্ছটি তোর । উচ্চে তুলে । নাচা

স্তবক : সুশৃঙ্খল রীতিতে পরস্পর সংশ্লিষ্ট চরণ পর্যায়ে নাম স্তবক।

যেমন: - সুখের লাগিয়া । এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া । গেলা ।।
অমিয় সাগরে । সিনান করিতে সকলি গরল । ভেলা।।

মিল : দুই বা তার বেশী একদল শব্দ বা শব্দাংশের (মুক্ত/স্বরান্ত বা রুদ্ধ/হলন্ত) প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ গত অসাম্য এবং তার পরবর্তী স্বরবর্ণের উচ্চারণগত সাম্যকে চলতি কথায় বলা হয় ‘মিল’। প্রবোধচন্দ্র সেন মিলের পারিভাষিক নাম দিয়েছেন

‘উপযমক’। মিলের অবয়ব কখনো একটি দলে কখনো দুটি দলে কখনো দুটির বেশি দলের। একদলাশ্রিত মুক্তদলান্তিক মিল তাদের হলুদমাখা গা, তোরো রথ দেখাতে যা।

দ্বিদলাশ্রিত স্বরান্ত মিল -

আমরা তো অল্পে খুশি, কী হবে দুঃখ করে?
আমাদের দিন চলে যায় সাধারন ভাত কাপড়ে

লয় : প্রবাহিত ধ্বনিস্রোতের উচ্চারণ গতিকে লয় বলে। লয় তিন প্রকার - ধীর, দ্রুত ও মধ্যম বা বিলম্বিত।

ক) ধীর লয় - ৮ বা ১০ মাত্রা বিশিষ্ট পূর্ণ পর্ব সমন্বিত কবিতার লয় ধীর। সাধারনত অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের লয় ধীর লয়ের হয়।

খ) দ্রুত লয় - পূর্ণ পর্ব সমন্বিত ৪ মাত্রা বিশিষ্ট কবিতার লয় দ্রুত হয়ে থাকে। সাধারনত স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্ত ছন্দের দ্রুত লয় হয়ে থাকে।

গ) মধ্যম বা বিলম্বিত লয় - পূর্ণ পর্ব সমন্বিত কবিতার লয় মধ্যম বিলম্বিত হয়ে থাকে। সাধারনত কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্তের ছন্দের লয় বিলম্বিত বা মধ্যম লয়ের হয়ে থাকে।

Sub Unit- 4

বাংলা ছন্দচর্চার ইতিহাস

(রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, প্রবোধচন্দ্র, অমূল্যধন ও তারাপদ ভট্টাচার্য)

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বাংলা সাহিত্যে নব যুগের সূত্রপাত। সেই যুগের বাংলা কাব্যের ইতিহাস আলোচনা করলেও এ কথার সত্যতা প্রতীত হয়। যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য কবিরা এই যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন প্রত্যেকেই বাংলা ছন্দের নব নব রীতির প্রবর্তন করে গেছেন। তবে অগ্রনায়ক হিসেবে সামনে থেকেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তার উত্তরকালে বাংলা ছন্দচিন্তায় যারা মনোনিবেশ করেছিলেন তাঁদের দুটি দলে ভাগ করা যায়। এঁদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার। অপরদিকে কবি ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, তারাপদ ভট্টাচার্য ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ :- বাংলা ছন্দের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় কবিপ্রতিভা যুগান্তর সৃষ্টি করেছে। তবে একথাও ঠিক রবীন্দ্রনাথই একমাত্র মৌলিক প্রতিভাশালী ছন্দশিল্পী নন। তাঁর পূর্বে মধুসূদন ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের মতো এত বহুমুখী নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা পরেও ছিল কিনা সন্দেহ। ছন্দে তার উল্লেখযোগ্য প্রতিভাগুলি সূত্রাকারে আলোচনা করা হল:-

১) বর্ণ নয়, ধ্বনির উপর বাংলা ছন্দ নির্ভরশীল, ছন্দের এই মর্মগত স্বাতন্ত্র্যকে তিনি যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। পরবর্তীকালে ধ্বনির ওপর বাংলা ছন্দের ভিত গড়ে ওঠে। -----

২) আধুনিক বাংলা ছন্দে একটি প্রধান রীতি হল - মাত্রাছন্দ বা, ধ্বনিপ্রধান ছন্দ যা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। ‘মানসী’ কাব্যে তিনি এই রীতির প্রবর্তন করেন। মাত্রাছন্দে প্রত্যেকটি হলন্ত অক্ষরকে, রবীন্দ্রনাথ দ্বিমাত্রিক ধরেন। পরবর্তীকালে এই ছন্দ সর্বজনপ্রিয় যা বাংলা ছন্দের ইতিহাসের নতুন ধারা বয়ে নিয়ে এল।

৩) প্রাচীন দ্বিপদী ত্রিপদী ছন্দে আবদ্ধ না থেকে রবীন্দ্রনাথ নানা নতুন ধাঁচের চরণ ব্যবহার ও প্রচলন করেছেন। ওজনের সাম্য বজায় রেখে যে নানা বিচিত্র সংকেতে চরণ রচনা করা যায় তা রবীন্দ্রনাথই প্রথম সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। চতুষ্পদিকচরণ নব নবপরিপাটীর ত্রিপদী, আঠা মাত্রার চরণ ইত্যাদির প্রচলনে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অধিক।

৪) অক্ষর যুক্তাক্ষর, স্বর, মাত্রা ধ্বনি, ঝাঁক, লয়, সম মাত্রক ছন্দ, তিনমাত্রামূলক, দুইমাত্রামূলক ছন্দ, ছত্রস্থ-দীর্ঘস্থর, হ্রস্ব শব্দ হলন্ত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের প্রকরণগত ব্যাখ্যা ও উপযোগী পরিভাষা নির্ধারণ তাঁর কৃতিত্ব। তবে পরিভাষার ক্ষেত্রে কখনো তিনি এক অর্থে একাধিক শব্দের প্রয়োগ করেছেন। আবার কখনো এক শব্দের একাধিক অর্থ করেছেন। যেমন ‘পদ’ শব্দের অর্থ কোথাও পংক্তি, কোথাও অর্থযতি ভাগ।

৫) পয়ারের শোষণশক্তি, ভারবহন কবিগুরুর বিশ্লেষণী দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এ বিষয়ে তার অভিমত “গদ্যছন্দ বোধের চর্চা নিয়মের পথে চলতে পারে, কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণ বোধমনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে তবে অলংকার শাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না।”

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত :- বাল্যকালে কবিতা লেখায় হাতে খড়ি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২২)। বাংলা ছন্দ রচনায় বিচিত্র এক্সপেরিমেন্টের ইতিহাস তাঁর ‘ছন্দ সরস্বতী’ নামক গ্রন্থে উপস্থাপিত আছে। ‘ছন্দের জাদুকর’ কবি - ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথের পরিণত চিন্তাভাবনা তাঁর ছন্দচিন্তায় ফুটে উঠেছে। সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ সম্পর্কিত অমূল্য চিন্তাভাবনা লিপিবদ্ধ করা হল -

১) সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দের তিনরীতির নামকরণ করেন - আদ্যা, হ্রদ্যা ও চিত্রা এই নামগুলি উপমা - রূপকধর্মের আভাস বহন করে। আদ্যা অর্থাৎ মিশ্রবৃত্ত, হ্রদ্যা অর্থাৎ দলবৃত্তরীতি।

২) ছন্দের পরিভাষাগুলোর মধ্যেও একধরনের কাব্যকতা এনেছেন। যেমন - সিলবল্ অর্থে ‘শব্দপাপড়ি’, অর্ধস্থর বোঝাতে ‘ভাঙা স্বর’ ‘রিদম’ অর্থে ছন্দস্পন্দন; ভাসলিবার বোঝাতে ‘স্বেচ্ছাছন্দ’ ইত্যাদি বোঝাতে তাঁর ছন্দচিন্তা অভিনবত্বের পরিচয়বাহী।

৩) ‘আদ্যা’ অর্থাৎ মিশ্রবৃত্তের পয়ার - ত্রিপদী ছন্দোবন্ধ সম্পর্কে বিপ্রদত্ত সূত্র - আট ছয় আট ছয়, পয়ারের ছাঁদ কয় ছয় ছয় আট ত্রিপদীর।

‘হ্রদ্যা’ অর্থাৎ সরলবৃত্তের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে কবি বলেছেন -

“পংক্তির বা শব্দের গোড়ায় ভিন্ন অন্য সকল জায়গায় যুক্ত অক্ষর প্রকৃতপক্ষে যে একজোড়া অক্ষর, এই কথাটা স্মরণ রাখলে, এই নতুন ছন্দের বিশেষত্ব বুঝতে কষ্ট হবে না। ইঁা আর এটাও স্মরণ রাখতে হবে ‘ঐ’ কার আর ‘ঔ’ কার হচ্ছে স্বর - সঙ্কর অর্থাৎ একজোড়া ভিন্ন জাতের স্বরবর্ণে তৈরি ইংরেজিতে যাকে বলে ‘diphthong’।

‘চিত্রা’ অর্থাৎ দলবৃত্ত সম্পর্কে বিরসূত্র - “এ ছন্দে হসন্ত বা গোটা অক্ষর গুনতে হয়। শব্দের যে যে অক্ষর উচ্চারণে হসন্ত, সেইগুলিতে হসন্তের চিহ্ন দিয়ে দ্যাখো, বুঝতে পারবে।”

- এইভাবে তিনছন্দের পার্থক্যকে ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

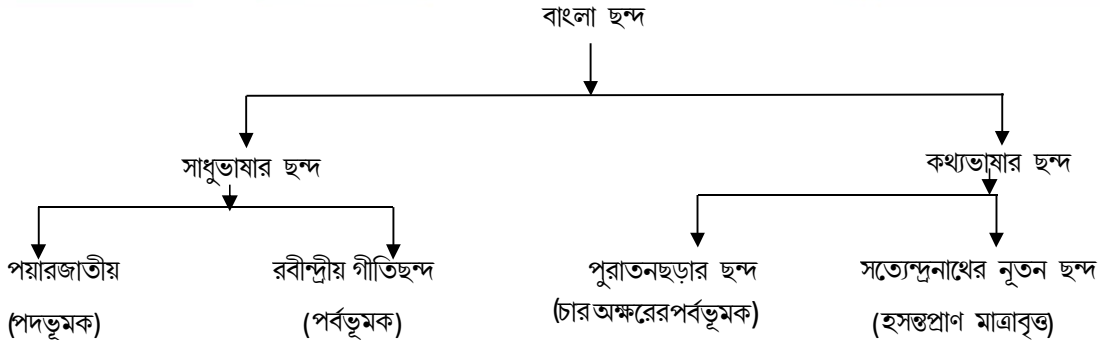
এছাড়াও বিভিন্ন বিদেশি ছন্দ, সংস্কৃত নানান ছন্দোবন্ধকে বাংলায় অনুবাদ করে তিনি একধরনের নতুন ছন্দ ধারাও তৈরি করেছিলেন।

মোহিতলাল মজুমদার : কবি-ছান্দসিক মোহিতলাল মজুমদারের ছন্দ সম্পর্কিত আলোচনাগুলি ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে শ্রাবণ এবং ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ থেকে শ্রাবণ এই দুইভাগে ‘শনিবারের চিঠি’ - তে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৫৫-তে হাওড়া ‘বঙ্গভারতের গ্রন্থালয়’র উদ্যোগে তাঁর ‘বাংলা কবিতার ছন্দ বইটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির প্রথম ভাগে পয়ার ছন্দ, অক্ষর ও মাত্রা, চরণ, পংক্তি ও পদ, পর্বভূমক ছন্দ, ছড়ার ছন্দ, সত্যেন্দ্রনাথের ‘হসন্ত প্রাণমাত্রাবৃত্ত’, বাংলা ছন্দ তত্ত্ব ইত্যাদির বিস্তারিত আলোচনা আছে। দ্বিতীয়ভাগে প্রধানত বাংলা পয়ার ও মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর নিয়ে আলোচনা। এবং পরিশিষ্টে বাংলা পদবন্ধ, বাংলা সনেট, বাংলা ছন্দে মিল সংক্রান্ত রয়েছে। মোহিতলাল মজুমদারের ছন্দ-সংক্রান্ত উদ্ধৃত গ্রন্থটির অনুসঙ্গে তার ছন্দসূত্রগুলি উল্লিখিত হল -

১. ভাষারূপ গত আশ্রয়কে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করে মোহিতলাল বাংলা তিন ছন্দোন্নতির নামকরণ করেন -

- ক) সাধুভাষাশ্রিত মাত্রিক পদভূমক বর্ণবৃত্ত (মিশ্রবৃত্ত)
- খ) সাধুভাষাশ্রিত মাত্রিক পর্বভূমক মাত্রাবৃত্ত (সরলবৃত্ত)
- গ) কথ্যভাষা নির্ভর পর্বভূমক অক্ষরবৃত্ত (দলবৃত্ত)

২. সত্যেন্দ্রনাথের মতো তিনিও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন উচ্চারণ- পার্থক্যই বাংলা ভাষার তিন ছন্দকে পৃথক করেছে। উচ্চারণগত দিক দিয়ে বাংলা ছন্দের যে শ্রেণিবিভাগ তিনি করেন তা নিম্নরূপ :



৩. ‘পয়ার’কে বাংলা কবিতার মেরুদণ্ড হিসাবে বিবেচনা করে তিনি বলেছেন :

“পয়ারের আসল রূপ - তাহার সেইমাত্রা পরিমাণ (১৪), এবং পদভাগ (৮+৬)। ৮+৮ পদভাগই যে ৮+৬ পয়ারের জনাসম্ভাবনার মূলে তা-ও তিনি স্বীকার করেছেন।

৪. মোহিতলালের মতে ছন্দের পূর্ণমাপ যতখানিতে ধরা থাকে তাকে ‘চরণ’ বলা যেতে পারে। তাঁর মতে এই ‘চরণ’কে পংক্তির আকারে সাজানো যেতে পারে। চরণের যতি-বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে তিনি ‘পদ’ হিসাবে নির্দেশ করেছেন। পদের আর বিভাগ নেই। তাই পয়ার জাতীয় ছন্দে এই পদই ছন্দের গতিভঙ্গি নির্দেশ করে, সেক্ষেত্রে ‘পদ’ই হয় ‘পর্ব’। অর্থাৎ ‘পর্ব’ ও ‘পদ’ কে তিনি অভিন্ন করে দেখতে চেয়েছেন।

৫. মোহিতলালের কাছে ছন্দ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ‘ছন্দবোধ’ই শেষ কথা। সেক্ষেত্রে বর্ণ, অক্ষর, মাত্রা - এই ধুনিতাত্ত্বিক সূত্রগুলিকে তিনি অপয়োজনীয় বলে মনে করেছেন।

৬. মোহিতলালের মতে পয়ারে পদভাগ, তাই তা পদভূমক, আর গীতছন্দে পর্বভাগ-সেইজন্য তা পর্বভূমক। তিনি আরও বলেছেন পর্বের মাত্রা হিসাব সুনির্দিষ্ট। পর্ব পদের চেয়ে আয়তনে ছোট, তা চরণকে সমান ভাগে ভাগ করে দেয়।
৭. মোহিতলাল দলবৃত্তে সাধারণত প্রবল প্রসঙ্গ ও চারমাত্রার পর্বকে স্বীকার করেছেন। এই ছন্দের উৎস হিসাবে তিনি ব্রতকথা, প্রাচীন প্রবচনের কথাই বলেছেন।

প্রবোধচন্দ্র সেন :

ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনই বাংলা ছন্দের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করেন। ভাষা বিজ্ঞানের আলোয় সুস্পষ্ট পরিভাষা রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা ছন্দের মৌলিক নীতি নিয়মগুলি আবিষ্কারের কৃতিত্ব সর্বাঙ্গিকভাবে তাঁরই। সমগ্রজীবন ব্যাপী ছন্দ সম্পর্কিত নানা আলোচনা, শতাধিক প্রবন্ধ রচনা করেন তিনি, যেগুলি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত। উদ্ধৃত গ্রন্থগুলিতে বাংলা ছন্দের যে বৈশিষ্ট্যগুলি নিরূপিত হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ:

- ১। প্রবোধচন্দ্র সেন ছন্দের সংজ্ঞায় বলেছেন : “সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিমিত বাকবিন্যাসের (ধ্বনিবিন্যাস) নামে ছন্দ”। বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের সঙ্গে ছন্দের যোগের এই দিকটি তিনি প্রথম যথার্থভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন।
- ২। একক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনিখন্ডকে তিনি বললেন ‘দল’-যা ছন্দপর্বগঠনের মূল অবলম্বন। ‘দল’কে তিনি গঠনগত দিক থেকে মুক্ত ও রুদ্ধ এই দ্বিবিধ ভাবে ভাগ করেছেন। আর উচ্চারণগত দিক থেকে ‘দল’কে হ্রস্ব ও দীর্ঘ এই দুটি ভাগে ভাগ করেছেন।
- ৩। দলের ওজন তথা পরিমাপের একককে তিনি ‘মাত্রা’ বলে চিহ্নিত করলেন। সংস্কৃত ছন্দের আদর্শে একটি হ্রস্বদলের সমপরিমাণ ধ্বনির পরিভাষা করলেন - ‘কলা’। এদিক থেকে ‘মাত্রা’কেও দুভাগে বিন্যস্ত করলেন - দলমাত্রা ও কলামাত্রা।

৪। নূতন ছন্দ পরিক্রমায় তিনি জানিয়েছেন “ছন্দের ধ্বনিপ্রকৃতি তথা শ্রুতিরূপ নির্ভর করে এই মাত্রাবিন্যাস রীতির উপরেই। বাংলা ছন্দের মাত্রা বিন্যস্ত হয় তিনটি স্বতন্ত্র রীতিতে।” দলমাত্রা ও কলামাত্রার নিরিখে তিনি মূলত দুইধরনের ছন্দরীতির অস্তিত্ব অনুভব করলেন। যেখানে তিনি পূর্বে বলেছিলেন ‘স্বরবৃত্ত’। আর যে রীতিতে কলামাত্রাই ছন্দপর্বের প্রধান উপাদান, তা হল কলাবৃত্ত রীতি। প্রথমযুগে এই রীতির নাম তিনি দিয়েছিলেন মাত্রাবৃত্ত। কলাবৃত্তের যে শাখায় সব রুদ্ধদলই প্রসারিত হয়, তা হল রলকলাবৃত্ত। আর যে শাখায় স্থান বিশেষে রুদ্ধদলের প্রসারণ ঘটে তাকে মিশ্রকলাবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্ত রীতি বলে। এই রীতির পূর্বনাম দিয়েছিলেন অক্ষরবৃত্ত। প্রবোধচন্দ্র তিনটি ছন্দরীতিতে যে মাত্রানীতি অনুসরণ করেছেন সাধারণভাবে তা হল -

- ক। দলবৃত্ত : মুক্তদল (হ্রস্ব বা দীর্ঘ) - ১দলমাত্রা
রুদ্ধদল (হ্রস্ব বা দীর্ঘ) - ১দলমাত্রা
- খ। কলাবৃত্ত : হ্রস্ব মুক্তদল - ১কলামাত্রা
দীর্ঘ মুক্তদল - ১কলামাত্রা
রুদ্ধদল - ২কলামাত্রা

- ৫। যতি ও প্রসঙ্গরূপের ধারণাটিও প্রবোধচন্দ্রের নিজস্ব, যা ছন্দবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
- ৬। উপপর্বরূপ, পর্বরূপ, পদরূপ, পংক্তিরূপ - বাংলা ছন্দের এই চতুরঙ্গ রূপের বিশ্লেষণ তিনি করেছেন। শুধু তাই নয়, পয়ার যে কোনো ছন্দরীতি নয়, তিন ছন্দরীতিই একটি রূপবন্ধ বিশেষ, তা প্রবোধচন্দ্রই প্রথম অত্যন্ত যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করেন।
- ৭। ছন্দচিন্তায় প্রবোধচন্দ্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যস্বচ্ছ ও স্ব-বিশ্লেষণী পরিভাষা সৃজন। তিনি শুধু ছন্দের শারীরিক সংগঠন নিয়েই ভাবেননি, রচনা করেছেন ছন্দচর্চার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় :

ছান্দসিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের ছন্দসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাভাবনা সংকলিত হয়েছে তাঁর ‘বাংলা ছন্দের মূলসূত্র’ গ্রন্থে। গ্রন্থটির প্রথম ভাগে যতি, পূর্ণযতি ও চরণ, অর্ধযতি ও পর্ব, অক্ষর ও মাত্রা, ছেদ, পর্বঙ্গ, মাত্রা সমকল্প, অক্ষরের শ্রেণিবিভাগ, মাত্রা পদ্ধতি, চরণের লয়, মাত্রাবিচার, ছন্দাবদ্ধ, স্তবক ও মিলসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ভাগে আলোচিত হয়েছে বাংলার প্রধান তিন ছন্দের জাতি, রীতি, লয় ও শ্রেণি। আর পরিশিষ্টে বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্বের

পুণোরালোচনার সঙ্গে বাংলা মুক্তবদ্ধ ছন্দ, বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ, বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের অবদান বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উদ্ধৃত গ্রন্থাবলম্বনে বাংলা ছন্দ সম্পর্কিত তাঁর ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি সূত্রাকারে বিবৃত হল :

১. বাংলা ছন্দ ধ্বনির ওপর নির্ভরশীল - অন্যান্য ছান্দসিকের মতো মূল্যধন ও তা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনরীতির উচ্চারণ গত তফাৎকেও বুঝতে পেরেছিলেন তিনি।

২. বাংলা ছন্দের তিনটি প্রধান রীতির নাম তিনি যথাক্রমে দিয়েছিলেন -

- ক) শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ বা দ্রুতলয়ের ছন্দ (দলবৃত্ত)
- খ) ধ্বনিপ্রধান ছন্দ বা বিলম্বিতলয়ের ছন্দ (সরলবৃত্ত)
- গ) তানপ্রধান ছন্দ বা ধীরলয়ের ছন্দ (মিশ্রবৃত্ত)

৩. তাঁর ছন্দ ধারণা ‘লয়’-এর ওপর নির্ভরশীল। ‘লয়’ অর্থাৎ উচ্চারণগতিকে তিনি প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন - দ্রুত, বিলম্বিত ও ধীর। এগুলিরও আবার অঙ্গস্র উপবিভাগ করেছেন।

৪. বাংলা ছন্দ syllable নির্ভর একথা স্বীকার করলেও অমূল্যধন syllable এর পরিভাষা হিসাবে অক্ষর শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অক্ষরের সংজ্ঞায় তিনি বলেছেন - “বাগযন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাহাই অক্ষর।” স্বরান্ত ও হলন্ত ভেদে, তাঁর মতে, অক্ষর দু’প্রকার।

৫. যতিকে অমূল্যধন দুইভাগে ভাগ করেন। ভাবযতির পরিভাষা হিসাবে তিনি ব্যবহার করেন ‘ছেদধঃ আর ছন্দোযতির পরিভাষা ‘যতি’। পূর্ণ ও অর্ধ ভেদে ছন্দোযতি তথা যতিকে তিনি দুভাগে ভাগ করেন। পূর্ণযতি পর্যন্ত ধ্বনিপ্রবাহের পরিভাষা হিসাবে তিনি ব্যবহার করেন ‘চরণ’। কিন্তু অর্ধযতি বিভাগকেও তিনি পর্ব হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, যা ছন্দের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করে।

৬. গদ্যরীতি সম্পর্কে তিনি বলেন - “গদ্যেরমাত্রা পদ্ধতি স্বাভাবিক মাত্রিক।... পদ্যোপবর্ষের অন্তর্ভুক্ত পর্বঙ্গগুলি হয় পরস্পর সমান হইবে, না - হয় তাহাদের মাত্রার ক্রম অনুসারে তাহাদিগকে সাজাইতে হইবে। কিন্তু গদ্যে নানা উপায়ে পর্বের মধ্যে পর্বঙ্গগুলি সাজানো যায়।”

৭. প্রবোধচন্দ্রের ‘মুক্তক’ ছন্দ সম্পর্কে তিনি অভিমত পোষণ করেন যে : “পলাতকার ছন্দকে Free verse এর উদাহরন বলা Free verse শব্দটির প্রয়োগ। সাগরিকার ছন্দও অবিকল এইরূপ - পূর্ণচ্ছেদ বা উপচ্ছেদ কত মাত্রার পর থাকিবে সে সম্বন্ধে কোনো নিয়ম নাই। সুতরাং এ ছন্দ অমিত্রাক্ষর জাতীয়।”

তারাপদ ভট্টাচার্য : অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য তাঁর ‘ছন্দোবিজ্ঞান’ (১৯৪৮) গ্রন্থে সৌন্দর্যতত্ত্বকে ভিত্তি করে বারটি অধ্যায়ে বাংলা ছন্দের নানাদিক দিয়ে আলোচনা করেছেন। লেখকের ‘বঙ্গীয় ছন্দোমীমাংসা’ ও ‘ছন্দোবিজ্ঞান’ গ্রন্থ দুটি সমন্বিত ও পরিমার্জিত হয়ে ‘ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দবিবর্তন’ নামে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি মনে করেন, “ছন্দের ইতিহাস এবং ব্যাকরণ পরস্পর সাপেক্ষ ও পরস্পরের পরিপূরক।” বাংলা ছন্দের ঐতিহ্যের অন্বেষণে তিনি যেমন সংস্কৃত, প্রকৃত, অপভ্রংশ ও অবহট্ট ছন্দের বিবর্তনের ইতিহাস রচনা করেছেন, তেমনি বাংলার বিভিন্ন ছন্দরীতির ক্রমবিবর্তনের ধারা আলোচিত হয়েছে। ছন্দচর্চার ইতিহাসে তারাপদ ভট্টাচার্যের ছন্দকলার রহস্য ভেদের প্রয়াস ও স্বকীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

অলংকার

অলংকার --- ভাষার সৌন্দর্য বিধায়ক কৌশল হল অলংকার।

“অনুপ্রাস --- উপমা --- রূপকাদি যে সমস্ত বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ ভূষন সাহিত্যের সৌন্দর্য সম্পাদন ও রসের উৎকর্ষ সাধন করে তাহাই অলংকার” (বাংলা অলংকার - জীবান্দ্র সিংহ রায়)

যেমন :- ১) চল চপলার চকিত চমকে করিছে, চরণ বিচরণ, - রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এই ছত্রটিতে একই ‘চ’ ব্যঞ্জন ধ্বনি অনেকবার উচ্চারিত হওয়ার একটি শ্রুতি-সৌন্দর্য সম্পাদিত হয়েছে। এখানে ‘চ’ ধ্বনি সৌন্দর্য সম্পাদন করে যে অলংকারটি তার নামে অনুপ্রাস অলংকার। কোনো বাক্য যখন পড়া হয় তার দুটি দিক আমাদের আকৃষ্ট করে।

১) শব্দের ধ্বনি আমরা কানে শুনতে পাই

২) অর্থ হয় মনোগোচর তাই শব্দের ধ্বনিরূপ ও অর্থরূপের আশ্রয়ে আলংকারিকরা সাহিত্যে দুই শ্রেণীর অলংকার সৃষ্টি করেছেন-

Sub Unit - I ১) শব্দালঙ্কার

Sub Unit - II ২) অর্থালঙ্কার

শব্দালঙ্কার :- শব্দের ধ্বনিরূপের আশ্রয়ের যে সমস্ত অলংকার সৃষ্টি হয় তাকে শব্দালঙ্কার বলে। শব্দালঙ্কারের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ

আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য - অনুপ্রাস যমক, বক্রোক্তি, শ্লেষ ও পুনরুক্তবদাভাস।

১) অনুপ্রাস - একই বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ, যুক্তভাবে হোক আর বিযুক্তভাবেই হোক, একাধিক বার ধ্বনিত হলে হয় অনুপ্রাস।

i) হায়রে হৃদয় তোমার সঞ্চয়

দিনান্তে নিশান্তে, শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।

এখানে ‘দিনান্তে’ ‘নিশান্তে’ ও ‘পথপ্রান্তে’ এই তিনটি শব্দে ‘আন্তে’ ধ্বনিগুচ্ছের বারবার বিনাস্যের দ্বারা ধ্বনিগত সৌন্দর্য সম্পাদন করা হয়েছে। সুতরাং উদ্ধৃতিটিতে অনুপ্রাস আছে। অনুপ্রাস বিভিন্ন ধরনের। যেমন :- অন্ত্যনুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস, লাটানুপ্রাস, শূতানুপ্রাস।

অন্ত্যনুপ্রাস :

১ পদ্যে পদান্তের সঙ্গে পদান্তের, চরণান্তের সঙ্গে চরণান্তের, ধ্বনিসাম্যের নাম অন্ত্যনুপ্রাস।

যেমন :- মহাভারতের কথা অমৃত সমান কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।

এখানে প্রথম চরণের শেষে ‘আ’ স্বরধ্বনি সহ ‘ন’ ব্যঞ্জনধ্বনি আছে দ্বিতীয় চরণের শেষে তারই অবিকল পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

সুতরাং এটা অন্ত্যনুপ্রাসের উদাহরণ।

বৃত্ত্যনুপ্রাস :

অনুপ্রাস প্রসঙ্গে বিশেষ অর্থে ‘বৃত্তি’ কথাটি প্রথম যোগ করেন অষ্টম শতাব্দীর উদ্ভট। তাঁর বৃত্তি মানে কলার ভঙ্গী। সেই সময় থেকে বৃত্ত্যনুপ্রাসের ‘বৃত্তি’ কথাটার অর্থ হয়ে গেছে রসের আনুগত্য। প্রকৃতপক্ষে সকলরকম অনুপ্রাসই রসানুগত অনুপ্রাস।

“যদি একটি ব্যঞ্জনধ্বনি একাধিকবার ধ্বনিত হয় কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনি গুচ্ছ যথার্থ ক্রমানুসারে সংযুক্ত বা বিযুক্তভাবে বহুবার ধ্বনিত হয়, তবে বৃত্ত্যনুপ্রাস হয়”।

যেমন :-

কেতকী কেশরে কেশপাশ করো সুরভি / ক্ষীণ কটিতেছে গাঁথি লয়ে পরো করবী।

ব্যাখ্যা :- এখানে ‘ক’ ব্যঞ্জনধ্বনি সাতবার এবং ‘শ’ ও ‘স’ ব্যঞ্জনধ্বনি চারবার আবৃত্তি করা হয়েছে। একই ধ্বনির অনেকবার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় উদ্ধৃতিতে বৃত্ত্যনুপ্রাস দেখা দিয়েছে। বৃত্ত্যনুপ্রাস সম্বন্ধে চারটি কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

ক) একটিমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ, দুবার ধ্বনিত হবে।

‘বঞ্জুলবনে মঞ্জুমধুর কলকণ্ঠের তরল তান’

এখানে - ‘ব’, ‘ম’ ‘ক’ এবং ‘ত’ মাত্র দুবার করে ধ্বনিত হয়েছে।

খ) একটিমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বহুবার ধ্বনিত হবে।

“বাজিল বনে বাঁশের বাঁশরী বনে বসে বাজাইছে বনবিহারী”

এখানে ‘ব’ প্রত্যেক শব্দের আদিতে ধ্বনিত হয়েছে।

গ) ব্যঞ্জনগুচ্ছ স্বরূপানুসারে মাত্র দুবার ধ্বনিত হয়।

‘জেগেছে যৌবন নব বসুধারা দেহে’।

- এখানে ‘যৌবন’ এর ‘ব’ এবং ‘ন’ এবং ‘নব’ র ‘ন’ এবং ‘ব’ এর স্থান পরিবর্তন হয়েছে। এই জাতীয় সাদৃশ্যকে স্বরূপ-সাদৃশ্য বলে।

ঘ) ব্যঞ্জনগুচ্ছ যুক্ত বা অযুক্তভাবে ক্রমানুসারে বহুবার ধ্বনিত হবে :

“এত ছলনা কেন বল না গোপললনা হল সারা”

--- এখানে অযুক্ত ব্যঞ্জনগুচ্ছ ‘লনা’ ক্রমানুসারে তিনবার ধ্বনিত হয়েছে।

ছেকানুপ্রাস :

একই ধ্বনিগুচ্ছ যদি দুটি বা তার বেশী ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত বা বিযুক্তভাবে ক্রমানুসারে মাত্র দুবার ধ্বনিত হয়, তবে ছেকানুপ্রাস হয়।

যেমন : -

“ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,

এখনি অঙ্ক, বন্ধ করো না পাখা”

এখানে ‘ন্ধ’ ধ্বনিগুচ্ছ সংযুক্তভাবে একইক্রমে মাত্র দুবার ধ্বনিত হয়েছে। তাই এটি ছেকানুপ্রাসের উদাহরন।

লাটানুপ্রাস :

তাৎপর্য মাত্রের ভেদে একই শব্দের পুনরাবৃত্তিকে লাটানুপ্রাস বলে। যমকে অর্থের ভেদ হয়, কিন্তু লাটানুপ্রাসে অর্থে এক থাকলেও তাৎপর্যের ঈষৎ ভেদ হয়।

যেমন : - ‘কালো তা সেই যতই কালো হোক’।

এখানে - দুটি ‘কালো’ অর্থেই ‘কৃষ্ণবর্ণ’ কিন্তু পুনঃপুনঃ ফলে তার নিবিড়তা প্রাপ্তি হয়েছে। বাঙলায় লাটানুপ্রাসের প্রয়োগ নেই বললেই চলে।

শ্রুতানুপ্রাস :

বাগযন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রুতিমধুর সমাবেশকে শ্রুতানুপ্রাস বলে। যেমন - বিজন বিপুল ভবনে রমনী হাসিতে লাগিল হাসি। এখানে ওষ্ঠ থেকে ‘বঞ্চ’ ‘বঞ্চ’ ‘পঞ্চ’ ‘ভঞ্চ’ ‘বঞ্চ’ ও ‘মঞ্চ’ ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রুতিমধুর সমাবেশ হয়েছে বলে তাই শ্রুতানুপ্রাস হয়েছে।

১। যমক : দুই বা তার বেশী ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরধ্বনিসমেত নির্দিষ্ট ক্রমে সার্থক বা নিরর্থক ভাবে ব্যবহৃত হলে যমক অলঙ্কার হয়।

যেমন :- ‘যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে’ এখানে ‘ভারত’ শব্দটি দুবার বসেছে দুটি অর্থ নিয়ে। প্রথম ‘ভারতে’ বলতে মহাভারতে এবং দ্বিতীয় ভারত বলতে ভারতবর্ষকে বোঝানো হয়েছে। বিভিন্ন অর্থে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি হলে বা তুল্য রূপ দুটি শব্দ ভিন্নার্থে বাক্য মধ্য ব্যবহৃত হলে যমক অলঙ্কার হয়।

প্রয়োগ বৈচিত্র্যের দিক থেকে যমক অলঙ্কার দুই প্রকার -

১. সার্থক যমক
২. নিরর্থক যমক

১. সার্থক যমক :- ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একই ধ্বনিযুক্ত শব্দের একাধিক বার উচ্চারণ হলে সার্থক যমক অলঙ্কার হয় ‘জীবে দয়া তব পরম ধর্ম ‘জীবে’ দয়া তব কই।’ এখানে ‘জীব’ শব্দের দুটি আলাদা আলাদা অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম জীব - প্রাণী বিশেষ দ্বিতীয় জীব - জীব গোষ্ঠামী

২. নিরর্থক যমক :- পুনরাবৃত্ত পদটির অর্থ সর্বদা বর্তমান না থাকলে নিরর্থক যমক হয়। যেমন :- যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল। এখানে ‘বন’ শব্দটি যৌবনের অংশ রূপে উচ্চারিত। কিন্তু তা অর্থহীন ও নিরর্থক দ্বিতীয় ‘বন’ শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে একটি অর্থযুক্ত পূর্ণ শব্দরূপে, যার অর্থ অরন্য। এ জন্য এটি নিরর্থক যমক। প্রয়োগ স্থানের ভিত্তিতেও চার ধরনের যমক দেখা যায় -

- ক) আদ্যযমক
- খ) মধ্যযমক
- গ) অন্ত্যযমক
- ঘ) সর্বযমক

বক্রোক্তি :-

কোনো কথার যে অর্থটি বক্তার অভিপ্রেত, সে অর্থটি না ধরে শ্রোতা যদি তার অন্য অর্থ গ্রহণ করে, তবে বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়।

বক্রোক্তি অলঙ্কার দুই প্রকারের হয় :-

১. শ্লেষ বক্রোক্তি ২) কাকু বক্রোক্তি

শ্লেষ বক্রোক্তি :- বক্তার বক্তব্য তাহার অভিপ্রেত অর্থে গ্রহণ না করে অন্য অর্থে গ্রহণ করা হলে শ্লেষ - বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়।

যেমন - প্রশ্ন :- বিপ্র হয়ে সুরাসক্ত কেন মহাশয়?

সুরে না সেবিলে বল কেবা মুক্ত হয়। প্রশ্নকর্তা সুরাসক্ত বলতে বোঝাতে চেয়েছেন সুরাই - আসক্তির কথা।

উত্তরদাতা ব্যবহার করেছেন দেবতাই (সুর) ভক্তির কথা।

কাকু বক্রোক্তি :-

‘কাকু’ শব্দের অর্থ স্বরভঙ্গী। যখন বক্তার কণ্ঠস্বরের বিশেষ ভঙ্গীর জন্য নেতিবাচক কথা ইতিবাচক অর্থ এবং ইতিবাচক কথা নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ করে তখন কাকু বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়।

যেমন :- রাবণ শিশুর মম, মেঘনাদ স্বামী, আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে।

উক্তিটি ইতিবাচক প্রশ্ন হলেও - প্রমীলা ভিখারী রাঘবকে ভয় করেন না - এই নেতিবাচক অর্থই তাহার উক্তির ভঙ্গি থেকে ধরা পড়ে। সখী ও যে এই অর্থ গ্রহণ করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে অভিপ্রেত অর্থ কণ্ঠস্বর আশ্রয় করে বলে কাকু - বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়েছে।

শ্লেষ :-

একটি শব্দ একবার মাত্র - ব্যবহৃত হয়ে বিভিন্ন অর্থ বোঝালে শ্লেষ অলঙ্কার বলে। ইহাকে শব্দ - শ্লেষেও বলা হয়ে থাকে।

যেমন :- “কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর, যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর”।

এখানে সমগ্র বাক্যের মধ্যে দুটি অর্থ পাওয়া যায়। একটি অর্থ -- ‘যে ভগবান চরাচরে ব্যাপ্ত, যাহার আলোকে সূর্য আলোকিত তাঁহাকে গুপ্ত কে বলে? আরেকটি অর্থ - যাহার প্রতিভার প্রভাকর নামক পত্রিকা উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হয় সেই ঈশ্বর গুপ্তকে অখ্যাত নামা কে বলে? তাঁর খ্যাতি চরাচরে ব্যাপ্ত।’ সুতরাং এটা শ্লেষ অলঙ্কারের উদাহরণ।

শ্লেষ অলঙ্কার দুরকমের -

১. সভঙ্গ শ্লেষ
২. অভঙ্গ শ্লেষ

সভঙ্গ শ্লেষ :- যদি শব্দকে না ভেঙ্গে একটি অর্থ এবং ভেঙ্গে ভিন্নতর অর্থ পাওয়া যায়, তবে তাহাকে সভঙ্গ শ্লেষ বলে।

যেমন :- অপরূপ রূপ কেশবে।

--- এখানে ‘কেশব’ শব্দটি আটুট রাখলে এর অর্থ হবে কেশবের অর্থাৎ কৃষ্ণের অপরূপ রূপ। কিন্তু ‘কেশব’ শব্দটিকে ভাঙলে ‘কে’+‘ব’ অর্থাৎ তখন এর অর্থ দাঁড়াবে অপরূপ শবের উপর কে দাঁড়িয়ে আছে? অর্থাৎ মা কালী।

অভঙ্গ শ্লেষ :- শব্দকে না ভেঙে অর্থাৎ পূর্ণরূপ রেখেই একাধিক অর্থে যদি তার প্রয়োগ করা হয় তবেই হয় অভঙ্গ শ্লেষ।

যেমন :- “অতি বড়ো বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।

কোনোঙন নাই তার কপালে আগুন।।

কু-কথায় পঞ্চমুখ কন্ঠ ভরা বিষ।

কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।।”

উদাহরণটিতে শব্দকে না ভেঙেও বিভিন্ন অর্থ পাওয়া যায়।

যেমন :- অতি বড়ো বৃদ্ধ পতি :- প্রথম অর্থ - স্বামী অত্যন্ত বৃদ্ধ

দ্বিতীয় অর্থ - জ্ঞানবৃদ্ধ

সিদ্ধিতে নিপুণ :- প্রথম অর্থ - নেশা ভাঙে দক্ষ

দ্বিতীয় অর্থ - বাকসিদ্ধ পুরুষ।

কপালে আগুন - প্রথম অর্থ - কপাল পোড়া

দ্বিতীয় অর্থ - শিবের তৃতীয় নেত্র (চোখ)

কু কথায় পঞ্চমুখ :- প্রথম অর্থ - খারাপ কথায় পঞ্চমুখ

দ্বিতীয় অর্থ - পঞ্চগনন

অর্থাৎ শব্দগুলিকে বিকল্পিত না করেই দুটি অর্থ পাওয়া যাচ্ছে, ফলে এটি অভঙ্গ শ্লেষ।

পুনরুক্ত বদাভাস :-

কোনো বাক্যে একই অর্থ একের বেশী শব্দ বিভিন্ন রূপ ব্যবহৃত হয়েছে বলে যদি মনে হয়, কিন্তু একটু মন দিলেই যদি দেখা যায় যে তারা একই অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, তাহলে যে অলঙ্কার হয় তার নাম পুনরুক্তবদাভাস। অর্থাৎ একই অর্থ বোঝায় এমন বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগে প্রথমেই যদি মনে হয় যে পুনরুক্তি ঘটেছে এবং পরে অর্থ পরিষ্কার হলে পুনরুক্তি দোষ বলে মনে হয় না - তখন পুনরুক্ত বদাভাস [= পুনরুক্ত বৎ (= মানে) আভাস] অলঙ্কার হয়। ‘পুনরুক্ত’ শব্দের অর্থ একই শব্দের পুনরাবৃত্তি। ‘আভাস’ মানে দেখতে প্রতিশব্দরূপে পুনরাবৃত্তির মতন, কিন্তু অর্থ বিভিন্ন। যেমন :- “তনু দেহটি সাজাব তব আমার আভরণে”।

‘তনু’ ও ‘দেহ’ শব্দের একই অর্থ। কিন্তু ‘তনু’ শব্দ এখানে রোগা, বা কৃশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একই রকম ভাবে - মৃগেন্দ্র কেশরী, কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে মিহ্রভবে?

এখানে ‘মৃগেন্দ্র’ ও ‘কেশরী’ উভয় শব্দের অর্থ ‘সিংহ’। কিন্তু ‘মৃগেন্দ্র’ শব্দটি ‘পশুরাজ’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরুক্তবদাভাস অলঙ্কার হয়েছে।

অর্থালঙ্কার :-

শব্দের অর্থরূপের আশ্রয়ে যে সমস্ত অলঙ্কারের সৃষ্টি তাদের অর্থালঙ্কার বলে। অর্থ ঠিক রেখে শব্দ বদলে দিলেও এই জাতীয় অলঙ্কার ক্ষুণ্ণ হয় না। শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের পার্থক্য হল শব্দের পরিবর্তন সহ্য করার শক্তি। এ শক্তি অর্থালঙ্কারে আছে, শব্দালঙ্কারের নেই।

অর্থালঙ্কার বহুসংখ্যক হলেও তাদের পাঁচটি শ্রেণী ভাগ করা যায় -

ক) সাদৃশ্য, খ) বিরোধ গ) শৃঙ্খলা ঘ) ন্যায় ঙ) গূঢ়ার্থ প্রতীতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আমাদের পাঠ্যের অন্তর্গত তিনটি শ্রেণীর অলঙ্কার নিয়ে আলোচনা হল:-

সাদৃশ্য :- ১) উপমা ২) রূপক ৩) উৎপেক্ষা ৪) সন্দেহ ৫) অপহুতি ৬) নিশ্চয় ৭) ভ্রান্তিমান ৮) অতিশয়োক্তি ৯) ব্যতিরেক ১০) সমাসোক্তি

বিরোধ :- ১) বিরোধাভাস ২) বিভাবনা ৩) বিষম

গূঢ়ার্থ প্রতীতি :- ক) অপভ্রুত অপশংসা খ) ব্যজন্তুতি গ) স্বভাবোক্তি

সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার :- সাদৃশ্য শব্দটির অর্থ সমতা, সাম্য, তুল্যতা, সার্থম্য। সাদৃশ্যমূলক অর্থালঙ্কারে দুটি বিষম বা বি-সদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

যেমন - বৃষ্টি পড়ে এখানে বারো মাস এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে,

উদাহরণটিতে ‘মেঘ’ ও ‘গাভী’ দুটিই বিসদৃশ। কিন্তু এখানে উড়ন্ত মেঘের ভেসে চলার সঙ্গে চরে বেড়ানো গাভীর তুলনা করা হয়েছে। এখানে মেঘ ও গাভীর চরার মধ্যে সাদৃশ্যময়তা থাকতে এটি সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার হয়েছে। সাদৃশ্য হয় বস্তুদুটির গুণগত, অবস্থাগত, ক্রিয়াগত অথবা গুণ অবস্থা - ক্রিয়ার নানা ভাবের মিশ্রণ গত ধর্মের ভিত্তিতে। সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের চারটি অঙ্গ। -

- ১) যাকে তুলনার বিষয়ীভূত করা হয় :- উপমেয়
- ২) যার সঙ্গে তুলনা করা হয় :- উপমান
- ৩) যে সাধারণ ধর্ম তুলনা সম্ভব করে :- সামান্য ধর্ম
- ৪) যে ভঙ্গীতে তুলনাটি দেখানো বা বোঝানো হয় :- সাদৃশ্য বাচক শব্দ

উপমা :-

উপমা কথাটির সাধারণ অর্থ তুলনা। একই বাক্যে স্বভাবধর্মে বিজাতীয় দুটি পদার্থের বিসদৃশ কোনো ধর্মের উল্লেখ না করে যদি শুধু কোনো বিশেষ গুণে, বা অবস্থায়, অথবা ক্রিয়ায় পদার্থদুটির সাম্য অর্থাৎ সাদৃশ্য দেখানো হয় তাহলে উপমা অলঙ্কার হয়। যেমন - “এও যে রক্তের মতো রাঙা দুটি জবাফুল”।

‘জবাফুল’ আর ‘রক্ত’ দুটি বিজাতীয় পদার্থ। রাঙা এদের সাম্য বা সাদৃশ্য ঘটিয়েছে। তাই এখানে ‘উপমা’ অলঙ্কার হয়েছে।

উপমা অলঙ্কারের চারটি অঙ্গ।

ক) উপমেয় খ) উপমান গ) সাধারণ ধর্ম ঘ) সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

উপমা অলঙ্কারকে সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় -

ক) পূর্ণোপমা খ) লুপ্তোপমা গ) মালোপমা ঘ) স্মরণোপমা ঙ) মহোপমা চ) বস্তু - প্রতিবস্তুভাবের উপমা ছ) বিশ্ব প্রতিবিশ্ব ভাবের উপমা

ক) **পূর্ণোপমা** :- যেখানে উপমার চারটি অঙ্গই - উপমেয়, উপমান, সাধারণধর্ম ও সাদৃশ্য বাচক শব্দ - প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান থাকে সেখানে পূর্ণোপমা অলঙ্কার হয়।

যেমন - “আষাঢ় মাসের মেঘের মতন মস্তুরতায় ভরা

জীবনটাতে থাকতে নাকো একটুমাত্র তুরা”

উপমেয় - জীবন, উপমান - আষাঢ়ের মেঘ সাদৃশ্যবাচক শব্দ - মতন, সাধারণ ধর্ম - মস্তুরতায় জীবন ও মেঘ বিজাতীয় পদার্থ, তুলনাটি একটি বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণটিতে চারটি অঙ্গই বর্তমান থাকতে পূর্ণোপমা অলঙ্কার হয়েছে।

খ) **লুপ্তোপমা** :- উপমার চারটি অঙ্গের মধ্যে উপমেয়, উপমান, সাধারণধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ যে কোনো একটির বা দুইটির উল্লেখ না থাকিলে লুপ্তোপমা অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ:- পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন?

উপমেয় - চোখ, উপমান - পাখির নীড় সাদৃশ্যবাচক শব্দ মত। উপমার চারটি অঙ্গের মধ্যে সাধারণ ধর্ম অনুপস্থিত। সুতরাং সংজ্ঞানুসারে লুপ্তোপমা অলঙ্কার হয়েছে।

গ) **মালোপমা** :- উপমেয় যেখানে মাত্র একটি এবং তার উপমান অনেক, সেইখানে হয় মালোপমা।

উদাহরণ :- সুখ অতি সহজ সরল, কাননের প্রস্ফুট ফুলের মতো, শিশু আননের হাসির মতন

উপমেয় - সুখ, উপমান - ফুল, আনন একটি উপমেয়ের দুইটি উপমান থাকায় এখানে মালোপমা অলঙ্কার হয়েছে।

ঘ) **স্মরণোপমা** :- কোনো বস্তুর স্মরণ বা অনুভব থেকে যদি একই ধর্মের কোন বস্তুকে মনে পড়ে যায় তখন তাকে স্মরণোপমা অলঙ্কার বলে। এই অলঙ্কারে বস্তু ও স্মৃত বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য থাকা চাই।

যেমন :- ‘কালো জল ঢালিতে কালো পড়ে মনে’

উদাহরণটিতে উপমেয় - কালো, উপমান - জল, সাধারণ ধর্ম - কালো।

উক্ত পংক্তিতে কালো জল ঢালতে গিয়ে শ্রী রাধিকার, কালো বরণের শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে পড়েছে। অর্থাৎ ‘কালো’ এই গুণে (সামান্য ধর্মের জোরে) উভয়েই সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়েছে। একের স্মরন অন্যকে মনে করিয়ে দিচ্ছে বলে এটি স্মরনোপমা অলঙ্কার হয়েছে।

ঙ) মহোপমা :- মহাকাব্যের বাবহারের উপযোগী উপমাই মহোপমা। আসলে মহোপমা হল মহাকাব্যিক অলঙ্কার। যে উপমা অলঙ্কারের উপমানের সৌন্দর্য এমনভাবে বাড়ানো হয় - যাতে একটি প্রায় সম্পূর্ণ নতুন চিত্রের সৃষ্টি হয় - তখন সেই অলঙ্কারকে বলা হয় মহোপমা। এই অলঙ্কারে উপমেয় অপেক্ষা উপমানই বিশেষভাবে সজ্জিত হয়।

চ) বস্তু - প্রতিবস্তুভাবের উপমা :- যে উপমা অলঙ্কারে উপমেয় ও উপমানের সাধারণ ধর্ম বস্তু প্রতিবস্তু ভাবাপন্ন অর্থাৎ ধর্ম দুটিরই ভাষা ভিন্ন কিন্তু অর্থ এক এবং সাদৃশ্যবাহক শব্দটিও বর্তমান থাকে তাকে বস্তু - প্রতিবস্তুভাবের উপমা বলা হয়। এই অলঙ্কারে সাধারণ ধর্ম একটি জটিল বাক্যে প্রকাশিত হয়।

যেমন - ‘একটি চুশন ললাটে রাখিয়া যাও,

একান্ত নির্জন সন্ধ্যার তারার মতো’।

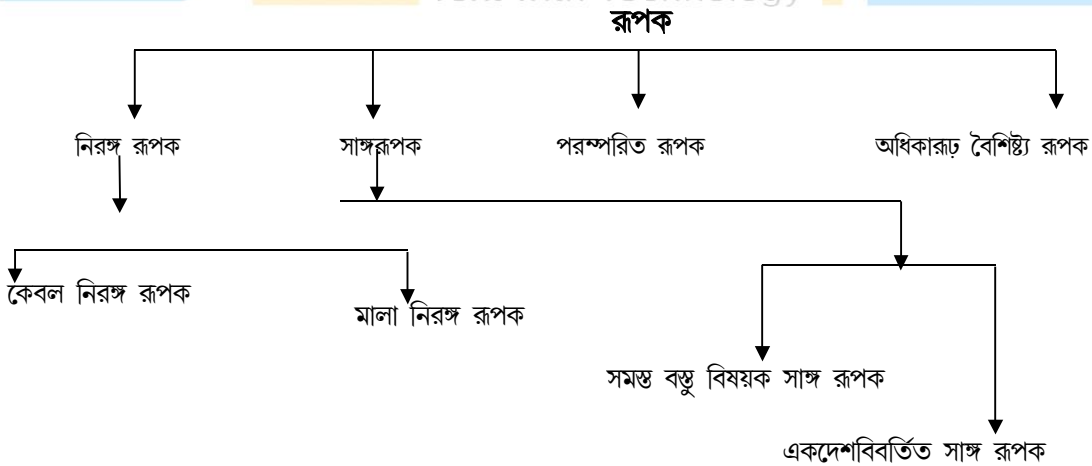
উদাহরণটিতে উপমেয় হল ‘চুশন’ উপমান হল ‘সন্ধ্যার তারা’। তুলনাবাহক শব্দ হলো ‘মতো’ উপমেয়ের সাধারণ ধর্ম ‘একটি’। উপমানের সাধারণ ধর্ম হল একান্ত নির্জন। যা ভাষারূপে উপমেয়ের সাধারণ ধর্ম থেকে ভিন্ন হলেও অর্থগত দিক থেকে অভিন্ন বা এক। সুতরাং সাধারণ ধর্ম বস্তু প্রতিবস্তু ধর্মী। এ কারনেই এটি বস্তু -প্রতিবস্তু ভাবের উপমা অলঙ্কার হয়েছে।

রূপক অলঙ্কার: উপমেয়কে অস্বীকার না করে, উপমেয় (বিষয়) ও উপমানের (বিষয়ী) তুলনা করবার সময় তাদের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হলে রূপক অলঙ্কার হয়। রূপকে ক্রিয়াটি হয় উপমানের অনুযায়ী।

যেমন - ‘আমি চাই উত্তরিতে জন্ম-জলধির নিস্তরঙ্গ বেলাভূমি’।

এখানে ‘জন্মের’ (উপমেয়) সহিত ‘জলধি’র (উপমান) অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। ‘উত্তরি’তে ক্রিয়াটি জলধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং উদাহরণটিতে রূপক অলঙ্কার আছে।

রূপকের প্রকারভেদগুলি একটি ছকের সাহায্যে দেখানো হল :-



নিরঙ্গ রূপক :

যখন একটি উপমেয়ের সঙ্গে এক বা একাধিক উপমানের অভেদ কল্পনা করা হয়, তখন নিরঙ্গ রূপক অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ :- “এমন মানব - জমিন রইল পতিত

আবাদ করলে ফলত সোনা”।

এখানে উপমেয় ‘মানবের’ সঙ্গে উপমান ‘জমিনে’র অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। ‘আবাদ করা’- এই ক্রিয়া উপমান ‘জমিনের’ অনুযায়ী। সুতরাং একটি উপমেয়ের সঙ্গে একটি উপমানের অভেদ কল্পিত হওয়ায় নিরঙ্গ রূপক অলঙ্কার হয়েছে।

নিরঙ্গ রূপক অলঙ্কার দূরকমের -

১. কেবল নিরঙ্গ রূপক :-

যে রূপক অলঙ্কারে একটিমাত্র উপমেয়’র সঙ্গে একটিমাত্র উপমানের অভেদ কল্পনা করা হয় তাকে কেবল-নিরঙ্গ-রূপক অলঙ্কার বলে।

যেমন - রূপের পাথারে আঁখি ডুবে সে রহিল।

যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।

- এখানে উপমেয় হল ‘যৌবন’ এবং উপমান হল ‘বন’। অর্থাৎ একটি মাত্র উপমেয়ের (যৌবন) সঙ্গে একটি মাত্র উপমানের (বন) অভেদ আরোপিত হওয়ায় এটি কেবল নিরঙ্গ-রূপক অলঙ্কার হয়েছে।

মালা নিরঙ্গ রূপক :-

যে নিরঙ্গরূপক অলঙ্কারে একটিমাত্র উপমেয়কে কেন্দ্র করে একাধিক উপমানের অভেদ কল্পিত হয়, তাকে বলে মালা-নিরঙ্গরূপক অলঙ্কার বলে।

যেমন : - ‘আমি কি তোমার উপদ্রব,

অভিশাপ দূরদৃষ্ট, দুঃস্থগ্ন গলগ্ন কাঁটা’।

উদাহরণটিতে উপমেয় একটি। সেটি হল ‘আমি’ উপমানগুলি হল - উপদ্রব অভিশাপ, দূরদৃষ্ট, গলগ্ন কাঁটা। একটিমাত্র উপমেয় (বিষয়ীর) অভেদ করায় এটি মালা নিরঙ্গ -রূপক হয়েছে।

এরকম দৃষ্টান্ত - “নীতের ওড়নী পিয়া গিরীষের বা বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না”।

সাজ রূপক :-

যেখানে বিভিন্ন অঙ্গসমেত উপমেয়ের সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গসমেত উপমানের অভেদ কল্পনা করা সেখানে সাজরূপক হয়।

যেমন :- রজনীর নীড়ে, ঘুমের পাখিরা উঠেছে জেগে, কঙ্কা জাগো আঁখি চলে আসে তাদের পাখার বাতাস লেগে।

উদাহরণটিতে উপমেয় হল রজনী, উপমান হল নীড় উপমেয়ের অঙ্গ হল ঘুম। উপমানের অঙ্গ হল ঘুম। উপমানের অঙ্গ হল পাখি। যেহেতু ‘নীড়’ না হলে ‘পাখির চলে না, নীড় তার আশ্রয়স্থল সেজন্য ‘পাখি’ ও ‘নীড়ে’র মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ ধরা যেতে পারে। তেমনি ‘রজনীর’ সঙ্গে ‘ঘুমের’ ও অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ রয়েছে।

সমস্ত বস্তুবিষয়ক সাজ রূপক :-

যে রূপকে উপমান এবং তার অঙ্গগুলি অভেদ - শব্দের দ্বারা অতি সহজে প্রকাশিত হবে। অথচ অভেদারোপ বুঝতে কষ্ট হবে না, সেই রকম সাজরূপকেই সমস্তবস্তুবিষয়ক সাজ-রূপক অলঙ্কার বলে।

যেমন - “নন্দের নন্দন চাঁদ পাতিয়ে রূপের ফাঁদ ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে।

দিয়ে হাস্যসুধাচার অঙ্গচ্ছটা আটা তার”।

কৃষ্ণকে ব্যাধরূপে কল্পনা করে রূপক করা হয়েছে। উপমেয় ‘নন্দের নন্দন’ অঙ্গী, তাঁর অঙ্গ রূপ, হাস্য, অঙ্গচ্ছটা। উপমান ‘ব্যাধ’ অঙ্গী ; তাঁর অঙ্গ ফাঁদ চার আটা --- যেহেতু এগুলি বাধ দিলে ব্যাধের চলে না অঙ্গী ও অঙ্গ সর্বত্রই রূপক বলে।

একদেশবর্তী সাজ রূপক :-

যে সাজ রূপক অলঙ্কারে উপমানগুলির কোনোটি বা কোনো কোনোটি যদি ভাষায় স্পষ্টভাবে প্রকাশিত না হয়ে, অর্থে বা ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়, তবেই হয় একদেশবর্তী সাজরূপক অলঙ্কার বলে।

যেমন - লাবণ্যের মধুভরা বিকশিত তন্নীর বয়ান।

পুরুষের আঁখিভৃঙ্গ কেন বল না করিবে পান,

উদাহরণটিতে মুখের লাবণ্যকে মধু বললে মুখকে ফুল বলতে হয়। কিন্তু কবি মুখকে ফুল বলেননি, তবু অর্থে তা বোঝা যাচ্ছে। কারন বিকশিত হওয়া মুখের, পক্ষে সম্ভব নয় বলে এটি ফুলের দিকেই নির্দেশ করেছে। বলাবাহুল্য ফুল এখানে উপমান। তাই অলঙ্কারটি একদেশবর্তী সঙ্গ-রূপক অলঙ্কার হয়েছে।

পরম্পরিত রূপক :- যদি একটি উপমেয়ের সহিত একটি উপমানের অভেদ কল্পনা অন্য উপমেয়ের সঙ্গে অন্য উপমানের অভেদ কল্পনা অন্য উপমেয়ের সঙ্গে অন্য উপমানের অভেদ কল্পনার কারন হয়ে দাঁড়ায় তবে পরম্পরিত রূপক হয়।

যেমন :- মরণের ফুল বড় হয়ে ফোটে জীবনের উদ্যানে।

উদাহরণটিতে ‘মরণের সঙ্গে ‘ফুলের’ অভেদ কল্পনার জন্যই জীবনের সঙ্গে’ উদ্যানের অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। সুতরাং এটা পরম্পরিত রূপকের উদাহরণ।

অধিকাররূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক :-

উপমানে একটি কল্পিত ও আবিস্তব বৈশিষ্ট্য অধিক আরূঢ় করে যদি উপমেয়ের সঙ্গে তাহার অভেদ দেখানো হয়, তাকে অধিকাররূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক বলে।

যেমন - কেবল, চোখের জলে ভরে দিতে পারি একটি অদৃশ্য শুষ্ক বঙ্গোপসাগরে।

উদাহরণটিতে উপমেয় হল চোখের জল। উপমান হল অদৃশ্য শুষ্ক ‘বঙ্গোপসাগর’ উপমান ‘বঙ্গোপসাগরের’ ‘উপরে ‘অদৃশ্য’ এবং ‘শুষ্ক’ এই দুটি অবাস্তব ধর্ম আরোপিত হয়েছে। ‘ভরে দিতে পারি’ বাক্যাংশটির দ্বারা উপমেয় ‘চোখের জলের’ সঙ্গে এই অসম্ভব উপমানের অভেদ কল্পিত হয়েছে বলে ‘অধিকাররূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক’ অলঙ্কার হয়েছে।

উৎপ্রেক্ষা :-

উৎপ্রেক্ষা শব্দের অর্থ হল সংশয়। নিকট সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে উপমান বলে প্রবল সংশয় হলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়।

যেমন - পড়ুক দুফোঁটা অশ্রু জগতের পরে যেন দুটি বাল্মীকির শ্লোক।

উদাহরণটিতে উপমেয় --- দু ফোঁটা অশ্রু। উপমান দুটি --- বাল্মীকির শ্লোক। উপমেয় দু ফোঁটা অশ্রুকে উপমান দুটি বাল্মীকির শ্লোক বলে কবির যে প্রবল সংশয় হয়েছে তা ‘যেন শব্দের প্রয়োগেই বোঝা যাচ্ছে। তাই অলঙ্কারটি উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়েছে।

উৎপ্রেক্ষা দুই প্রকারের - বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ও প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা :-

যে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে নিকট সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে উপমান বলে প্রবল সংশয় হলে এবং সংশয়বাচক শব্দটির উল্লেখ থাকলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়।

যেমন: - “অর্ধমগ্ন বালুচর দূরে আছে পড়ি যেন দীর্ঘ জলচর রৌদ্র পোহাইছে শুয়ে”।

এখানে উপমেয় হল বালুচর। উপমান দীর্ঘ জলচর। ‘যেন’ শব্দটির সংযোগে উপমেয় ‘বালুচর’ কে উপমান ‘জলচর’ বলে সংশয় হচ্ছে। তাই এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়েছে।

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা :-

যে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে নিকট সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে যদি উপমান বলে প্রবল সংশয় হয় এবং সংশয়সূচক শব্দটির উল্লেখ না থাকেও সংশয়ের ভাবটি বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় তাকে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার বলে।

যেমন: - “একখানি গ্রাম শোভে জলমগ্ন মাঠে, গঙ্গা মৃত্তিকার ফোঁটা গগন ললাটে”।

এখানে উপমেয় হল গ্রাম। উপমান হল গগন ললাট। এখানে উৎপ্রেক্ষা বাচক শব্দ নেই। কিন্তু উপমেয় ‘গ্রাম’ যেন উপমান আকাশের কপালে (গগন ললাট) গঙ্গা মাটির ফোঁটা বলে কবির কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে- তাই এটি প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়েছে।

সন্দেহ :-

কবি যখন চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য উপমেয় ও উপমান দুটি ক্ষেত্রেই সমান সংশয় সৃষ্টি করেন তখনই সন্দেহ অলঙ্কার হয়।
যেমন - সোনার হাতে সোনার চুড়ি, কে কার ‘অলঙ্কার’।

এখানে উপমেয় হল সোনার হাত এবং উপমান হল সোনার চুড়ি। সোনার চুড়িটি শোভাপাচ্ছে নাকি সোনার চুড়িটির জন্যই হাতটির শোভা বর্ধন পাচ্ছে-তাতে সংশয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থাৎ উপমেয় ও উপমান উভয় ক্ষেত্রেই সমান সংশয় সৃষ্টি হচ্ছে তাই সন্দেহ অলঙ্কার হয়েছে। কি, কিম্বা অথবা না, নাকি, কে, কার প্রভৃতি শব্দ এই অলঙ্কারের বাচক।

“একি হেরিলাম আমি, গগনের শশী সহসা এলো কি। ধরনীর বুকে নামি।”

এখানে উপমান গগনের শশী উপমেয় পক্ষটি (নারীর মুখ) উল্লেখ নেই। তবে তা ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়। সংশয় উভয় দিকে। তাই সন্দেহ অলঙ্কার হয়েছে।

অপহুতি :-

অপহুতি অলঙ্কারে উপমেয় অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়কে অস্বীকার করে অপ্রকৃতকে অর্থাৎ উপমানকে স্বীকার করে নেওয়া বা প্রকাশ করা হয় বলেই এই অলঙ্কারের নাম অপহুতি অলঙ্কার। অর্থাৎ উপমেয়কে অস্বীকার করে যখন উপমান প্রতিষ্ঠা পায় তখন তাকে অপহুতি অলঙ্কার বলে।

এই অলঙ্কার ‘না’ ‘নয়’ ‘ছলে’ ‘নহে’ ইত্যাদি অস্বীকার বোধক অব্যয় শব্দের ব্যবহার হয়।

যেমন: - ‘এতো মালা নয় গো, এ যে তোমার তরবারি।

উদাহরণটিতে উপমেয় মালা। উপমান হল তরবারি। অস্বীকার করার শব্দ = নয়। এখানে উপমেয় মালাকে অস্বীকার করে উপমান তরবারিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। উপমানের এই প্রতিষ্ঠার জন্য অপহুতি অলঙ্কার হয়েছে।

নিশ্চয় :-

যে অলঙ্কারে উপমানকে নিষিদ্ধ বা গোপন করে উপমেয়কেই প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন নিশ্চয় অলঙ্কার হয়। অপহুতির ঠিক বিপরীত বিষয় হল নিশ্চয়। নিশ্চয় অলঙ্কারে হয় সাধারনত: নাই, নহে, নয়, না ইত্যাদি না বাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়।

যেমন - ‘এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভঁৎসনা’ এখানে উপমেয় হল চোখের জল। উপমান হল ভঁৎসনা। উপমান ‘ভঁৎসনা’ কে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে উপমেয়, ‘চোখের জল’কে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে তাই এটি নিশ্চয় অলঙ্কার হয়েছে।
এরকমই দৃষ্টান্ত

- “অসীম নীরদ নয়, ওই গিরি হিমালয়”
- “কি আর কহিব দেব।
কাঁপছে এ পুরী রঞ্জেবীর পদভরে, নহে ভুকম্পনে”।

ভ্রান্তিমান :-

সাদৃশ্যবশত: এক বস্তুকে অপরবস্তু বলে যদি ভ্রম হয় এবং সেই ভ্রম যদি সাধারণ না হয়ে কবিকল্পনায় চমৎকারিত্ব লাভ করে তাহলে হয় ভ্রান্তিমান অলঙ্কার।

যেমন - “চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিলা কি গ্রাস”।

এখানে উপমেয় হল সীতা (উহা)। উপমান হল ‘চন্দ্রকলা’ রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করে, উপমেয় ‘সীতা’ কে উপমান ‘চন্দ্রকলা’ বলে ভুল হচ্ছে। কারণ সীতা ও চন্দ্র উভয়ই সুন্দর। এ কারণেই ভুল করে রাহু চন্দ্রের বদলে সীতাকে গ্রাস করেছে একারণেই এটি ভ্রান্তিমান অলঙ্কার।

অতিশয়োক্তি :-

উপমেয় ও উপমানের অভেদত্বের জন্য উপমান উপমেয়কে একেবারে গ্রাস করে ফেললে, অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয় এখানে উপমান সর্বসর্বা রূপে অতিনিশ্চিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে উপমেয় সাধারনত: উল্লেখ হয় না।

যেমন - “মারাঠার যত পতঙ্গপাল কৃপাণ অনলে আজ,

ঝাঁপ দিয়া পড়ি ফিরে নাকো যেন গর্জিলা দুমরাজ”।

এখানে ‘পতঙ্গপালা’ উপমান। উপমানের উপমেয় ‘সৈনিকবৃন্দ’ উহ্য রয়েছে উপমেয়ের সঙ্গে উপমানের অভেদত্বের জন্য উপমান পতঙ্গপাল উপমেয় সৈনিকবৃন্দকে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে। অতএব উপমান পতঙ্গপালের সর্বসর্বাপেক্ষে অতিনিশ্চিত ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য এটি অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়েছে।

ব্যতিরেক :-

উপমেয়কে উপমানের চেয়ে উৎকৃষ্ট কিম্বা নিকৃষ্ট করে দেখালে ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়। উৎকর্ষ বা অপকর্ষের কারণ উল্লেখ থাকতে পারে আবার নাও পারে। ব্যতিরেক কথার অর্থ পৃথক করণ বা ভেদ।

যেমন - ‘তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ’।

এখানে উপমেয় হল তুমি উপমান হল - কীর্তি (সাজাহান) ‘চেয়ে’ শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে ‘তুমি’ অর্থাৎ ‘সাজাহান’ তাঁর কীর্তি (উপমান) অপেক্ষা মহৎ। উপমেয়’র উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে।

তাই এটি ব্যতিরেক অলঙ্কার। ব্যতিরেক অলঙ্কার দু’রকম --

(১) উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক

(২) অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক

উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক :- যখন উপমানকে নিন্দিত করে উপমেয়’র উৎকর্ষ স্থাপন করা হয় তখন তাকে উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক অলঙ্কার বলা হয়।

অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক :- যখন উপমান অপেক্ষা উপমেয়’র অপকর্ষ বর্ণিত হয় -- তখন তাকে অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক অলঙ্কার বলে।

সমাসোক্তি :

প্রস্তুতে বা উপমেয়ে অপ্রস্তুতের বা উপমানের ব্যবহার আরোপ করা হলে সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়। অর্থাৎ এককথায় নিজীব বা অচেতন উপমেয়-র উপর সজীব বা চেতন উপমানের কাজ বা গুণ আরোপ করা হলে তাকে সমাসোক্তি অলঙ্কার বলে।

যেমন - “সম্মুখ উর্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ
দিব না দিব না যেতে নাহি শুনে কেউ”।

--- এখানে উপমেয় হল ঢেউ। উপমান হল মানুষ। যেতে দেব না বলে আত্ননাদ করা মানুষের ধর্ম। এই ধর্মটি উপমেয় ‘ঢেউ’ এর উপর আরোপ হয়েছে। উপমান উহ্য কিন্তু তার কাজের উপরই উপমেয়’র প্রতিষ্ঠা। তাই এটি সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়েছে।

বিরোধমূলক অলঙ্কার :-

অনেকসময় কোন বক্তব্যকে চমৎকারিত্বদান করার জন্য একটি বর্ণিতব্য বিষয়কে বিশেষ জোরের সঙ্গে উল্লেখ করার লক্ষ্যে বক্তা তাঁর উক্তি-তে একটি আপাতবিরোধের সৃষ্টি করেন। এই আপাত বিরোধের ফলে যে অলঙ্কারের সৃষ্টি হয় তাকে বিরোধমূলক অলঙ্কার বলে।

যেমন - “কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই”

--- উদাহরণটিতে একটি আপাত বিরোধ ঘটেছে। কারণ ‘মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরেনাই’ বাক্যটিতে এই যে মরেও না মরা এখানেই বিরোধের আভাস ঘটিয়েছে। এ কারনেই এটি বিরোধমূলক অলঙ্কার হয়েছে।

বিরোধাভাস অলঙ্কার :-

দুটি বস্তুর মধ্যে যদি আপাত বিরোধ দেখা যায়, এবং ঐ বিরোধ যদি চমৎকারিত্ব বা কাব্যোৎকর্ষ সৃষ্টি করে, তাহলে বিরোধাভাস অলঙ্কার হয়।

যেমন - ‘সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুরা’

- এখানে ‘সীমার মাঝে’ অসীমের স্থিতি আপাত বিরোধী চিন্তা। কিন্তু অসীম ঈশ্বরের অবস্থান সীমিত বিশ্বেও বিরাজমান। তাই এখানে আপাত বিরোধের সৃষ্টি মনে হলেও তা পরোক্ষ কাব্যোৎকর্ষ দান করেছে। তাই বিরোধাভাস অলঙ্কার হয়েছে। একই রকম দৃষ্টান্ত --- ‘বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে’।

বিভাবনা :-

বিনা কারণে কার্যোৎপত্তির নাম বিভাবনা। অর্থাৎ কারণ ছাড়া বা কারণের অভাবহেতু কার্যের উৎপত্তি ঘটলে বিভাবনা অলঙ্কার হয়। এখানে কারণ বলতে ‘প্রসিদ্ধকারণ’ কে বুঝতে হবে। এতে প্রসিদ্ধকারণ থেকে কার্য হচ্ছে না এইটুকু দেখিয়ে অন্য একটি কল্পিত কারণের সাহায্যে কার্যসিদ্ধি করা হয়। ফলে বিরোধের অবসান হয়ে যায়। অর্থাৎ বিভাবনা অলঙ্কারের প্রসিদ্ধ কারণের দ্বারা কাজ সম্পাদিত হয় না। হয় কল্পিত কারণের দ্বারা।

যেমন - “বিনা মেঘে বজ্রঘাত অকস্মাৎ ইন্দ্রপাত

বিনা বাতাসে নিবে গেল মঙ্গলপ্রদীপ।”

- উদাহরণটিতে বজ্রঘাত, ইন্দ্রপাত এবং দীপনির্বাণ এই কার্যগুলির প্রসিদ্ধ কারণ যথাক্রমে মেঘ, কল্পান্ত (এক এক ইন্দ্রের স্থিতিকাল এক এককল্প) এবং বায়ু। প্রসিদ্ধ কারণের অভাবসত্ত্বেও বোঝা যাচ্ছে অন্য একটি অদৃশ্যকারণ আছে -- যা অনুক্ত। অর্থাৎ বিনা মেঘে বজ্রঘাত এবং বিনা বাতাসে মঙ্গলপ্রদীপ নিবে যাওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। অথচ দেখা গেল ওটাই হয়েছে। আর এ-কারণেই এটি বিভাবনা অলঙ্কার হয়েছে। বিভাবনা অলঙ্কার দুইপ্রকার --- অনুক্তনিমিত্ত বিভাবনা ও উক্তনিমিত্ত বিভাবনা।

অনুক্তনিমিত্ত বিভাবনা :-

যখন বিভাবনা অলঙ্কারে কারণ উল্লেখ না থেকে কার্যসম্পাদন হয় তখন তাকে অনুক্ত নিমিত্ত বিভাবনা অলঙ্কার বলা হয়।

যেমন --- “মেঘ নাই তবু অঝোরে ঝরিল জল, ফুল ফুটিল না আপনি ধরিল ফল --

স্বপ্নেও কভু ভাবি নাই, প্রিয়তম, এমনি করিয়া সহসা আসিয়া নয়ন জুড়াবে মমা”

--- আমরা জানি মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরে। ফুল থেকে ফল হয়। অথচ এখানে মেঘ না থেকেও বৃষ্টি ঝরছে। ফুল না ফুটেও ফল হচ্ছে। অর্থাৎ কারণ বিনা কার্য সম্পাদন হয়েছে। অর্থাৎ কারণটি এখানে অনুক্ত থেকেও কার্যসম্পাদন হচ্ছে। যেমন একইরকম ভাবে চিন্তা ভাবনা ছাড়াই মনোন্ধামনা পূর্ণ হচ্ছে। স্বপ্নেও কবি যা চিন্তা করেননি তাই ঘটেছে। অর্থাৎ পূর্ব সংকেত ব্যতীত প্রিয়তম-র আগমন ঘটেছে। আর এজন্যই কারণ অনুক্ত থেকেও বা কারণ ছাড়াই কার্য সম্পাদন হচ্ছে বলে এটি অনুক্ত নিমিত্ত বিভাবনা অলঙ্কার হয়েছে।

উক্ত নিমিত্ত বিভাবনা :-

যখন কখনো বিভাবনা অলঙ্কারে কারণ -এর উল্লেখ থাকে এবং কার্যসম্পাদন হয় তখন তাকে উক্ত নিমিত্ত বিভাবনা অলঙ্কার বলে।

যেমন -- “এলে জীবনের বিমূঢ় অন্ধকারে ঘরে দ্বীপ নেই -

তবু আলোকোজ্জ্বল তোমার ছটায় দেখে নিই আপনারে”।

- উদাহরণটিতে আলোর প্রসিদ্ধ কারণ দীপ। কিন্তু দীপের অস্তিত্ব এখানে না থাকলেও লাভ্য ছটার রশ্মিকে কল্পিত কারণ রূপে ভেবে নিয়ে সেই কল্পরশ্মিতে নিজেকে দেখার মনোভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ এটি উক্ত। আর এ কারণেই উক্ত নিমিত্ত বিভাবনা অলঙ্কার হয়েছে। অর্থাৎ কারণ উল্লেখ থাকলে উক্ত নিমিত্ত বিভাবনা অলঙ্কার আর কারণ উল্লেখ না থাকলে অনুক্ত নিমিত্ত বিভাবনা অলঙ্কার হয়।

বিষম :-

কারণ এবং কার্যের যদি বৈষম্য বা বিরূপতা ঘটে, কিংবা কারণ থেকে ইচ্ছানুরূপ ফলের পরিবর্তে যদি অবাস্তব ফল আসে বা একাধারে যদি অসম্ভব ঘটনার মিলন হয় তাহলে বিষম অলঙ্কার হয়। সুতরাং বিসদৃশ বস্তুর বর্ণনা অর্থাৎ কারণ ও কার্যের মধ্যে বৈষম্য দেখা দিলে বা বিসদৃশ বস্তুর একত্র সমাবেশ হলে তখন তাকে বিষম অলঙ্কার বলে। অর্থাৎ বিষম অলঙ্কার হয় কার্যত দুভাবে -

ক) কার্য -কারণের বৈষম্য জনিত কারণে, ও

খ) দুটি বিষম বস্তুর মিলন হলে।

যেমন - “অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো সেই তো তোমার আলো।”

- এখানে কারণ হল অন্ধকার। আরকার্য হল আলো। অর্থাৎ কারণ ও কার্যের গুণ বৈষম্য ঘটায় এটি বিষম অলঙ্কার হয়েছে।
একই রকম দৃষ্টান্ত -

“সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেলা।”

- উদাহরণটিতে কারণ থেকে যে ফল পাওয়ার কথা তার পরিবর্তে অবাস্তব ফল এসেছে। রাখা সুখের জন্য ঘর বাঁধলেও তা আগুনে পুড়ে গেল। অমিয় সাগরে স্নান করতে গেলে তা বিষ সাগরে রূপান্তরিত হল। অর্থাৎ এখানে কারণ ও কার্যের বৈষম্য হওয়ার জন্য ‘বিষম’ অলঙ্কার হয়েছে।

গূঢ়ার্থ প্রতীতিমূলক অলঙ্কার :-

যখন আসল অর্থ লুকিয়ে থাকে আর একটি বাচ্যার্থে অবয়বে ; তখন তাকে গূঢ়ার্থ প্রতীতিমূলক অলঙ্কার বলে। অর্থাৎ এই অলঙ্কারে কোন একটি বিষয় বর্ণিত হয়। কিন্তু তা থেকে ভিন্নতর বিষয় ব্যঞ্জিত হয়। আসলে বর্ণিত বক্তব্যের মধ্যে একটা গূঢ় অর্থ নিহিত থাকে। অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয় থেকে বিষয়ান্তরের প্রতীতি সৃষ্টি হলে গূঢ়ার্থ প্রতীতিমূলক অলঙ্কার হয়।

যেমন - “অতি বড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ
কেবল আমার সাথে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।”

- উদাহরণটিতে দুটি অর্থ বিদ্যমান। প্রথম অর্থ দেবী চন্ডী বলেন তাঁর স্বামী অত্যন্ত বৃদ্ধ, নেশাখোর, কোন গুণ নেই, তার কপাল পোড়া। সবসময় তিনি কুকথা বলেন। এবং সবসময় তার সাথে কলহ করে। এগুলি আপাত দৃষ্টিতে নিন্দা বলে মনে হলেও এর ভেতরেই আর একটি গূঢ় অর্থ লুকিয়ে আছে। যা শিবের প্রশংসারই সামিল। প্রতিটি শব্দ ভাঙলেই তা বোঝা যাবে। জ্ঞান বৃদ্ধপতি (অতি বড় বৃদ্ধপতি), সিদ্ধিদাতা অর্থাৎ বাকসিদ্ধ (সিদ্ধিতে নিপুণ)-তে নিপুণ, এমন কোন গুণ নাই তার অজানা (কোন গুণ নাই তার), ত্রিলোচনের অধিকারী অর্থাৎ ললাটে অগ্নি বহনকারী (কপালে আগুন)। ভাল কথায় অর্থাৎ এখানে ‘কু’ বলতে ভাল (কু-কথায়) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পঞ্চানন যা শিবের অপর নাম অর্থাৎ পাঁচমুখ (পঞ্চমুখ), সমুদ্র মন্ত্রনের সময় যে বিষ উদ্ভূত হয়েছিল সেই বিষ কণ্ঠধারন করে শিব নীলকণ্ঠ (কণ্ঠভরা বিষ)। পরবর্তী অর্থ দ্বন্দ্ব বলতে এখানে ঝগড়া নয় এখানে দ্বন্দ্ব বলতে মিল বোঝানো হয়েছে। (কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ) অর্থাৎ সরল করলে এর অর্থটি দাঁড়াবে --- অতি বড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ শিবের এমন কোন গুণ নাই যেটি তার অজানা। তার কপালে ত্রিলোচন। সর্বদা পঞ্চমুখ থেকে সকলের জন্য ভাল কথা বা মঙ্গলের কথাই নির্গত হয়। কণ্ঠে বিষ ধারণ করে হয়েছে নীলকণ্ঠ। আর আমার সঙ্গে (দেবী) সর্বদাই তার মিল। অর্থাৎ উদাহরণটিতে একটি আপাত অর্থ এবং একটি গূঢ় অর্থ থাকায় সেটি গূঢ়ার্থ প্রতীতিমূলক অলঙ্কার হয়েছে।

অপ্রস্তুত-প্রশংসা :-

বিশদ ভাবে বর্ণিত অপ্রস্তুত থেকে যদি ব্যঞ্জনায় প্রস্তুতের প্রতীতি হয় তাহলে হয় অপ্রস্তুত -প্রশংসা অলঙ্কার। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ‘প্রস্তুত’, ‘প্রকৃত’, ‘প্রাকরণিক’, ‘প্রাসঙ্গিক’ শব্দগুলি সমার্থক এবং এদের অর্থ কবির বর্ণনীয় বিষয়। অপ্রস্তুত প্রশংসায় কবি তাঁর বর্ণনীয় বিষয় - সম্বন্ধে থাকেন নীরব এবং মুখর হয়ে ওঠেন অবর্ণনীয়কে নিয়ে। অর্থাৎ অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার বলতে বোঝায় -অপ্রস্তুত অর্থাৎ অবর্ণনীয় বিষয়ের উল্লেখ করে যখন প্রস্তুত অর্থাৎমূল বক্তব্য বিষয়কে বোঝানো হয়-তখনই তাকে অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার বলে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য অপ্রস্তুত বলতে বোঝায় যে বিষয়টি আসলে বলতে চাওয়া হয়নি, আর প্রস্তুত বলতে বোঝায় যেটা আসলে বলতে চাওয়া হয়নি, আর প্রস্তুত বলতে বোঝায় যেটা আসলে বর্ণনীয় বিষয়। এখানে প্রশংসা কথার অর্থ স্তুতি বা বন্দনা নয়, বর্ণনা।

যেমন- “প্রাচীরের ছিদ্রে এক নাম গোত্রহীন / ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন / ধিক্ ধিক্ করে তারে কাননে সবাই / সূর্য উঠি বলে তারে ভালো আছে ভাই।”

- এখানে প্রকৃত বর্ণনীয় বা প্রস্তুত বিষয় হল উদার চরিত্রের মহানুভবতা। অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনা হচ্ছে সূর্যের মহানুভবতা। কারণ সূর্য ছোট একটি ফুলকেও সমান মর্যাদা দিয়েছে। সুতরাং এখানে অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনার দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ের প্রতীতি হয় বলে এখানে অপ্রস্তুত -প্রশংসা অলঙ্কার হয়েছে।

ব্যঙ্গভূতি :-

নিন্দার ছলে ভূতি অর্থাৎ প্রশংসা এবং প্রশংসার ছলে নিন্দার অভিব্যক্তিকে বোঝালে ব্যঙ্গভূতি অলঙ্কার বলে।

যেমন - ‘কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে প্রচেষ্টা’

- সমুদ্রের বুকে সেতু রচনা করে রামচন্দ্র সমুদ্র-বন্ধন করেছেন। অথচ এই অসম্ভব কাজটি অর্থাৎ সমুদ্রকে বন্ধন করা সম্ভব নয়। তাই ক্ষুর রাবণ এই সেতু বন্ধনকে সুন্দর মালা বলে প্রকারান্তরে ষিকার জানান। ‘সুন্দরমালা’ কথাটি শুনতে প্রশংসা সূচক হলেও গূঢ়ার্থে নিন্দাসূচক। কারণ অপরায়ে সমুদ্র রামের কাছে পরাজিত হয়েছে। অর্থাৎ আপাত -প্রশংসা সূচক অর্থে কথাটি ব্যবহৃত হলেও গূঢ়ার্থে নিন্দাসূচক। এ কারনেই এটি ব্যঙ্গভূতি অলঙ্কার হয়েছে।

এই রকমই দৃষ্টান্ত - “অতি বড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ

কোন গুণ নাই তার কপালে আগুণ।”- [নিন্দার ছলে প্রশংসা]

“বন্ধু তোমরা দিলে নাকো দান, রাজ সরকার রেখেছেন মান।”

যাহা কিছু লিখি অমূল্য বলে অ-মূল্যে নেন কিনে।” - [প্রশংসার ছলে নিন্দা]

স্বভাবোক্তি :-

বস্তুভাবের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব প্রকৃতির যথাযথ অথচ সূক্ষ্ম এবং চমৎকার বর্ণনার নাম স্বভাবোক্তি অলঙ্কার। এই অলংকারে বস্তু-স্বভাবের সমস্ত ধর্ম ও গুণ বর্ণিত হলেও তা সাধারণ মানুষের চোখে ধরা না পড়লে কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। ফলে বস্তু জগতকে সুন্দরতর করে তার প্রতিফলন ঘটে এই অলংকারে। তাই সমগ্র বস্তু জগতের সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্ব বর্ণনাই হলো স্বভাবোক্তি অলংকারের মূল বৈশিষ্ট্য। তাই আমরা বলতে পারি যখন কোনো পদার্থ বা ক্রিয়ার যথাযথ এবং চমৎকার বর্ণনা করা হয় তখন তাকে স্বভাবোক্তি অলংকার বলে।

যেমন - “একখানি ছোট ক্ষেত আমি একলা চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।

পরপারে দেখি আঁকা তরুচ্ছায়া মশী মাখা

গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাতবেলা এপারেতে ছোটো ক্ষেত, আমি একলা।”

- উদাহরণটিতে ছোটো একটি ক্ষেত-এর দৃষ্টান্তকে দেখানো হয়েছে। যে ক্ষেতটিকে ঘিরে তীব্রবেগে ছুটে খেলা করে চলেছে ভরা বর্ষার নদীস্রোত। তাই জলবেষ্টিত এই চাষের ক্ষেতে নিঃসঙ্গ চাষি একা দাঁড়িয়ে নদীর পরপারে ছায়ায় ঘেরা মেঘাবৃত আকাশের নীচে এক গ্রামকে সকাল বেলায় অস্পষ্টভাবে দেখছেন। আসলে রোমান্টিক কবি নিজেকে এখানে চাষি বলে মনে করেন। তাই কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়ে এপারে ছোটো ক্ষেত ও-পারে বর্ষার প্রভাতে আলো - আঁধারিতে মোড়া একটি গ্রামের মাঝখানে বহমান একটি স্রোতধারা। কিন্তু কবি তখন নিঃসঙ্গ, অসহায়। কবির দৃষ্টিতে এই যে নিসর্গ বা প্রকৃতির বর্ণনা তাতে যেনমুক-বধির প্রকৃতি দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। তাই অলংকারটি ‘স্বভাবোক্তি’ অলংকার হয়েছে।